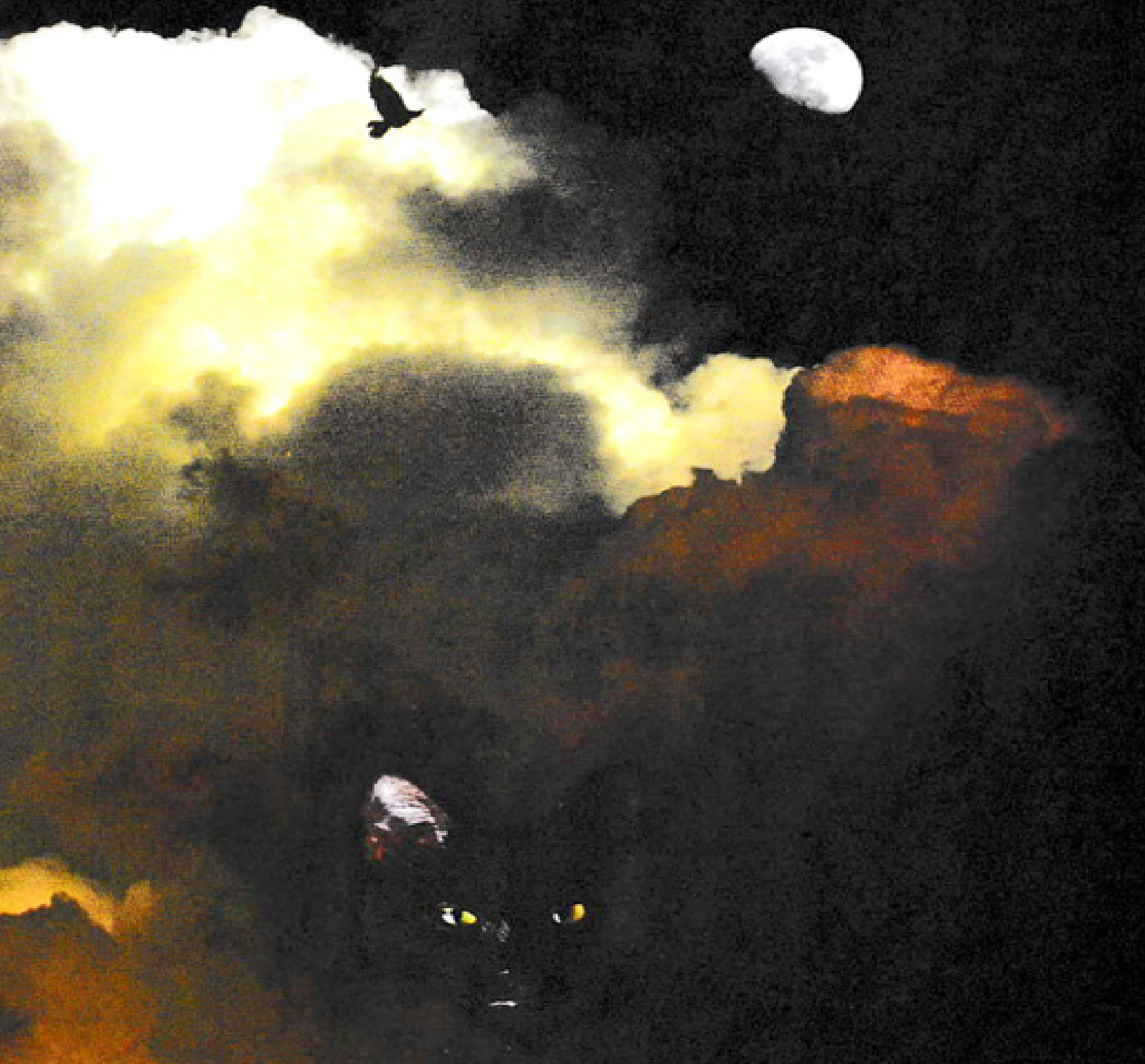


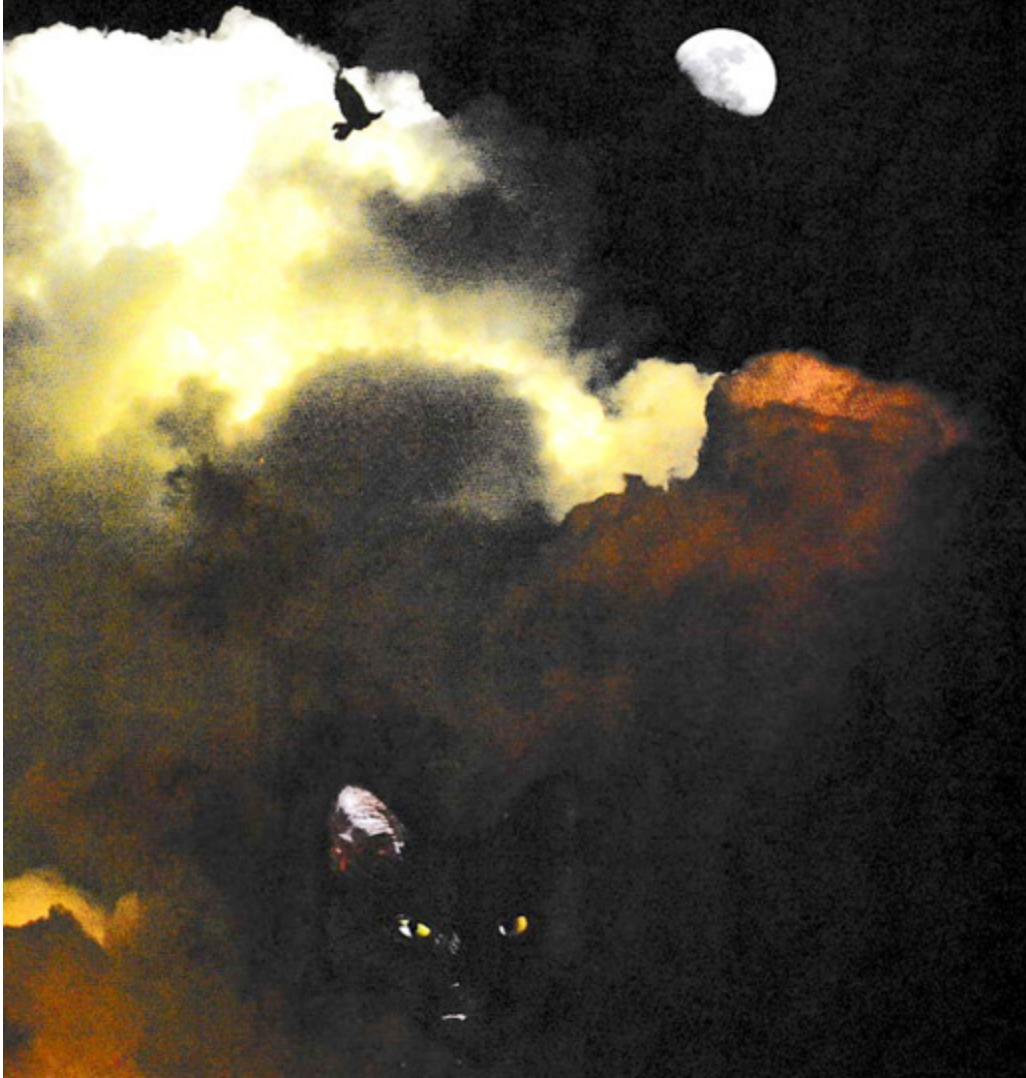
শ্রেষ্ঠ গল্প

এডগার অ্যালান পো



শ্রেষ্ঠ গল্প

এডগার অ্যালান পো



শ্রেষ্ঠ গল্প

এডগার অ্যালান পো

অনুবাদ: মহীউদ্দীন আহমেদ

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা। ৭৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ ভাদ্র ১৩৯৭ আগষ্ট ১৯৯০

পঞ্চম সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রকাশক মো. আলাউদ্দিন সরকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৭ ময়মনসিংহ রোড,
বাংলামিটার, ঢাকা ১০০০ GRPN SNSeobrY S brbybrCt\va

মুদ্রণ গ্রাফসম্যান রিপ্ৰোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ।

মূল্য: একশত টাকা মাত্র

SBN-984-18-0072-1

RESHTHO GALIPO The best stories of Edge Allan Poe. Translated by
Mohiuddin Ahmed Edited by Abdullah Abu Sayeed with introduction by
Ahmad Mazhar Published by Bishwo Shahitto Kendro 17 Mymensing
Road, Banglannotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Price: Tk. 100.00 only

ভূমিকা

এডগার অ্যালান পো: “বিভীষিকার নরকে উদভ্রান্ত আত্মিক”

বিভীষিকাগ্রন্থ মনোজগতের কথাকার, কবি, সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক, সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গোয়েন্দা চরিত্রের স্রষ্টা এডগার অ্যালান পো মার্কিন সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। তার মাত্র চল্লিশ বছরের স্বল্পপরিসর জীবন ছিল দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর ব্যর্থ-প্রেমের বেদনায় পরিকীর্ণ।

১৮০৯ সালের ১৯ জানুয়ারি আমেরিকার বোস্টন শহরে এডগার অ্যালান পো-এর জন্ম। তিনি ছিলেন মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোর শহরের অভিনেতা ডেভিড পো জুনিয়র এবং ইংরেজ বংশোদ্ভূত অভিনেত্রী এলিজাবেথ আরনল্ড পো-এর দ্বিতীয় সন্তান। এডগার অ্যালান পো-এর পিতামহ বাল্টিমোরের ডেভিড পো ছিলেন আমেরিকান বিপ্লবের একজন বিপ্লবী। ১৮১১ সালে ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে; অনুমিত হয় যে পিতারও মৃত্যু ঘটে এরই কাছাকাছি সময়ে। অনাথ এডগার অ্যালান পো ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে নিঃসন্তান জন অ্যালান-এর পরিবারে আশ্রিত হিসেবে বেড়ে উঠতে থাকেন। জন অ্যালান তার শিক্ষারও ব্যবস্থা নেন। পো-এর নামের অ্যালান অংশটি এই জন অ্যালান-এর কাছ থেকে পাওয়া। ১৮১৫ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডে এবং ইংল্যান্ডে উচ্চাঙ্গ ধারার শিক্ষা লাভ করেন। এর পরে রিচমন্ডেও একই ধারার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। ১৮২৬ সালে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ মাসের অধ্যয়নকালে গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি, স্প্যানিশ এবং ইতালীয় ভাষা শিখতে থাকেন। কিন্তু সেখানে জুয়া খেলায় বিপুল পরাজয়ের ফলে অভিভাবকদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। আনুষ্ঠানিক অধ্যয়নেরও ইতি ঘটে সেখানেই। এই ঘটনার পর আবার রিচমন্ড-এ ফিরে আসেন তিনি। ভার্জিনিয়ায় অধ্যয়নকালেই তার প্রেমিকা সারাহ এলমিরা রয়েস্টার অন্য একজনকে বিয়ে করেন। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতার বই টেমারলেন অ্যান্ড আদার পোয়েমসা-যা প্রচ্ছন্নভাবে এলমিরাকে উদ্দেশ্য করে রচিত। এই সময়েই অ্যালান পরিবারের সঙ্গে তার তিক্ত কলহের সূত্রপাত ঘটে। এক পর্যায়ে গৃহত্যাগ করেন তিনি।

চরম দারিদ্র্যে নিপতিত এডগার অ্যালান পো এই সময়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই এডগার এ পেরি ছদ্মনামে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু পালক-মাতা মিসেস অ্যালান-এর মৃত্যুর পর জন অ্যালান সেনাবাহিনী থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনেন এবং মার্কিন সামরিক অ্যাকাডেমি ওয়েস্ট পয়েন্ট-এ যোগদানের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ১৮৩০-এ সামরিক অ্যাকাডেমিতে যোগদানের আগেই বাল্টিমোর থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘আল আরাফ টেমারলেন অ্যান্ড মাইনর পোয়েমস (১৮২৯)’। এই বইয়ের কবিতাগুলোয় জন মিল্টন ও টমাস মুর-এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। এক বছরের মধ্যেই তিনি সামরিক

অ্যাকাডেমি থেকে বহিষ্কৃত হন—এক সপ্তাহের মধ্যে একদিনও ড্রিল ক্লাসে উপস্থিত না থাকবার অপরাধে। এরপর ন্যুইয়র্কে যান তিনি। ১৮৩১ সালে সেখান থেকে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ পোয়েমস। এটি তাঁর নির্বাচিত কবিতাসমূহের সংকলন। ইসরাফিল ও টু হেলেন—এই দুই বিখ্যাত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এতে। তাঁর এই সময়ের কবিতায় কিটস, শেলি এবং কোলরিজের প্রভাব রয়েছে। এরপরই ফিরে আসেন বাল্টিমোর-এ; শুরু হয় ছোটগল্প লেখা। ১৮৩৩ সালে ম্যানস্ক্রিপ্ট ফাউন্ড ইন এ বটল গল্পটি লিখে বাল্টিমোর-এ ৫০ ডলারের এক পুরস্কার জিতে নেন। ১৮৩৪ সালে পোলিশিয়ান নামে একটি বিয়োগাত্মক রচনা লেখেন তিনি। অবশ্য সেটি তার জীবনকালে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে ১৮২৩ সালে। ১৮৩৫ সালে পো রিচমন্ড-এ চলে আসেন এবং আত্মীয়া মিসেস ক্লেম-এর সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে সাউদার্ন লিটারেরি মেসোনজার পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন তিনি। এই সময়েই সাহিত্য সমালোচক হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠতে শুরু করেন পো। বিস্ময় ও বিভীষিকার গল্প লেখার সূচনাও এই সময়েই। মিসেস ক্লেম-এর কন্যা ভার্জিনিয়াকে বিয়ে করেন। ১৮৩৬ সালের ১৬ মে। ভার্জিনিয়ার বয়স তখন মাত্র ১৩। এ-সময়ে পো-কে দেখা গেছে প্রেমময় স্বামী ও দায়িত্বশীল জামাতার ভূমিকায়। মাতৃস্থানীয় মিসেস ক্লেমকে উদ্দেশ্য করে ১৮৪৯ সালে তিনি লেখেন ‘টু মাই মাদার’ নামে একটি প্রশস্তিমূলক কবিতা। ১৮৩৭ সালে অতিরিক্ত পানাসক্তির কারণে রিচমন্ডের চাকরিটিও হারান। এরপরই তিনি আবার চলে যান ন্যুইয়র্কে। সেখানে ১৮৩৮ সালে লেখেন দীর্ঘ গল্প বা নভেলা— দ্য ন্যারোটভ অব আর্থার গর্ডন পিম। এতে বাস্তবধর্মী অনুষ্ণের সঙ্গে রয়েছে কল্পজাগতিক উদ্ভটতা। সমুদ্র সম্পর্কিত কল্পকাহিনী হিসেবে এই নভেলাটিতে ভিন্নধর্মী নিরীক্ষা ছিল। এর প্রথম দিককার অধ্যায়গুলোতে ইংরেজ লেখক ড্যানিয়েল ডিফোর কথা কিছুটা মনে এসে গেলেও এ কথা বলতেই হবে যে এতে সুস্পষ্ট এক ধরনের ভিন্নতাও রয়েছে। যে সমুদ্র ভ্রমণের ছবি এই লেখায় আঁকা হয়েছে তা ভয় আর বিস্ময়ের আশ্চর্য এক প্রতীকী জগতে ভ্রমণের ছবি। পো আর এক মার্কিন লেখক হারম্যান মেলভিল-এর মাঝিডিক থেকে এই নভেলা লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

১৮৩৯ সালে এডগার অ্যালান পো ফিলাডেলফিয়াতে বার্টনস জেন্টলম্যান ম্যাগাজিন-এর সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মাসে একটি করে ফিচার লেখার চুক্তি হয় তাঁর সঙ্গে। এখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লেখেন অতিপ্রাকৃত ও ভীতিরসের গল্প উইলিয়াম উইলসন এবং দ্য ফল দি হাউস অব অ্যাশার। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত হয়। এডগার অ্যালান পো-এর গল্পগ্রন্থ ‘টেলস অব দ্য গ্রোটেক্স অ্যান্ড অ্যারাবেক্স’। ১৮৪০-এর জুন মাসে বার্টন’স জেন্টলম্যান ম্যাগাজিন-এর কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু ১৮৪১ সালে আবার ফিরে আসেন। কারণ ততদিনে পত্রিকার মালিকানা হাতবদল হয়ে চলে গেছে নতুন উত্তরাধিকারীর কাছে। এবার

পত্রিকার নাম হয় গ্রাহামস লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন। এখানেই প্রকাশিত হয় পো রচিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম গোয়েন্দা গল্প ‘দ্য মোর্ডর ইন দ্য রু মার্গ’। ১৮৪৩ সালে তিনি লেখেন ‘দ্য গোল্ড বাগা’। এটি লেখার জন্য ফিলাডেলফিয়ার "ডলার নিউজপেপার"-এর ১০০ ডলারের পুরস্কার পান। এর জন্য ব্যাপক খ্যাতিলাভ করেন তিনি।

১৮৪৪ সালে পো আবার ন্যুইয়র্কে ফিরে আসেন। সেখানে সান’ পত্রিকার জন্য লেখেন ‘বেলুন হাক্স’। আমৃত্যু বন্ধু এন. পি. উইলিস-এর অধীনে ন্যুইয়র্ক মিরর পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন সে সময়েই। ১৮৪৫ সালের ২৯ জানুয়ারি আমেরিকান রিভিউ পত্রিকায় পো-এর বিখ্যাত কবিতা দ্য ব্ল্যাভেন প্রকাশিত হলে তিনি জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি স্বল্পায়ু পত্রিকা ব্রডওয়ে জার্নাল-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ সালের দিকে এখানে তার সব গল্প পুনর্মিাদ্রত হতে শুরু করে।

১৮৪৫ সালে কবিতার সংকলন ‘দ্য ব্ল্যাভেল অ্যান্ড অ্যাডার পোয়েমস’ এবং নির্বাচিত গল্পের সংকলন ‘টেলস’ বই আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬ সালে তিনি চলে যান ন্যুইয়র্ক শহরের নতুন অংশ ফোর্ডহ্যাম-এ। এখানে অবস্থানকালে তিনি গডেইজ লেডিজ বুক (মে-অকটোবর ১৮৪৬) পত্রিকার জন্য লেখেন ‘দ্য লিটারেটি অব ন্যুইয়র্ক’। এই লেখাগুলো সেই সময়ের খ্যাতিমান মানুষদের জীবনের নানা অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাবলি অবলম্বনে রচিত।

১৮৪৭ সালের ৩০ জানুয়ারি পো-এর স্ত্রী ভার্জিনিয়া দীর্ঘ পাঁচ বছর যক্ষ্মারোগে ভুগে ফোর্ড হ্যামের কটেজে মারা যান। এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পো-এর জীবন ছিল ট্রাজিক বিষাদে পরিপূর্ণ। জীবনের অসহ্য বিষাদ থেকে মুক্তি পেতে তিনি ক্রমশ পানাসক্ত হয়ে পড়েন। পানাসক্তি তাঁকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে, কোনো চাকরি করারও অযোগ্য হয়ে পড়েন। তিনি। কিন্তু যাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন। তারা পো-কে জানতেন একজন নমস্বভাব, দায়িত্ববান, সৌজন্যশীল ও কর্মঠ মানুষ হিসেবে। কেউ কেউ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন পো কখনোই পানাসক্ত হতে পারেন না; কারো কারো মতে মদ্যপান করার মতো শারীরিক ক্ষমতা ছিল না বলে সামান্য পান করলেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ভার্জিনিয়ার প্রতি তাঁর অনুরাগ এত বেশি ছিল যে জানা যায় ভার্জিনিয়ার সঙ্গে যে ঘরে থাকতেন, ভার্জিনিয়ার মৃত্যুর পর সেই কক্ষেই তিনি উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকতেন দিনের পর দিন; এমনকি খাওয়ার কথাও ভুলে যেতেন। এইরকম মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৪৭ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় এক মাস বেশিমানায় অসুস্থ ছিলেন বলে সেই সময়ে তাঁর একমাত্র সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে কবিতা ‘উলালিউম’। কিন্তু পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৪৮ সালে তিনি আবার বহুপ্রজ লেখক হয়ে উঠেন। ফর অ্যানি, এনাবেল ল এবং এলডোরাডো এই বছরই লেখেন। এ ছাড়া এ বছরই তিনি

লেখেন “ইউরেকা” নামে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত এক অধ্যাত্মধর্মী, মরমী গ্রন্থ। মহাবিশ্ব সম্পর্কে লেখার ব্যাপারে তিনি উদ্ভুদ্ধ হয়েছিলেন জ্যোতির্বিদ জে. পে, নিকোল-এর কাছে থেকে। ওই সময়ই মিসেস সারাহ হেলেন হুইটম্যান-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় তার। ১৮৪৮-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনি রিচমন্ডে বেড়াতে যান। সেখানে কৈশোরকালের প্রেমিকা বিধবা মিসেস শেলটনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এরপর থেকে পো-এর গতিবিধি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত ১৮৪৯ সালের শেষের দিকে নিখোঁজ হন তিনি। খুঁজে পাওয়া যায় অক্টোবরের ৩ তারিখে। ৭ অক্টোবর ১৮৪৯-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে ওয়াশিংটন কলেজ হাসপাতালে। বাল্টিমোরের ওয়েস্ট মিনিস্টার আর্চার্ড-এ সমাহিত হন তিনি।

এডগার অ্যালান পো-এর সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের অতিপ্রাকৃত ও অশুভত্বের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাঁর একান্ত নিজস্ব উত্তেজনাকর স্বপ্ন, বিরল দৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় এক জগৎ তাঁর শিল্পের উপজীব্য। তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণতই নিজস্বতাচিহ্নিত, স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনাপ্রতিভা ও কলাকৌশলে পূর্ণ। সমকালীন সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য ছিল খুবই গুরুত্ববহ। আদর্শবাদ ও সাংগীতিকতা তাঁর কবিতাকে, নাট্যসৃজনপ্রবণতা তার ছোটগল্পকে এমন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল যে সমকালেই অ্যালান পো স্বদেশে ও বিশ্বে সমাদর পেতে শুরু করেছিলেন। পো-এর ব্যক্তিত্বে ছিল বিস্ময়কর এক দ্বৈতসত্তা। সমকালীনদের বিচারের সময় সর্বদাই তার মধ্যে পাওয়া যেত দুইটি সত্তার উপস্থিতি। যাদের পছন্দ করতেন তাদের প্রতি পো-এর আচরণ ছিল নিবেদিত এবং প্রীতিপূর্ণ অন্যেরা শুধুই সমালোচনার পাত্র। তিনি যাঁদের সমালোচনা করতেন তাদের কাছে তিনি প্রতীয়মান হতেন আত্মকেন্দ্রিক ও বিরক্তিকর এবং নীতিহীন স্বভাবের মানুষ হিসেবে। সে কারণে পো-এর কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন তারা। বীভৎস দুঃস্বপ্ন কি তাড়া করে ফিরত তাকে? অন্ধকার অপরাধের জগৎ অথবা কবরস্থানের গা-ছমছম-করা অনুভূতি কি অস্থির করে রাখত তাঁর সত্তাকে?

এডগার অ্যালান পো-এর শিল্পকর্মের গভীরে প্রবেশ করলে আতঙ্ক বা বিভীষিকা। এবং বিষাদময়তাকেই চোখে পড়বে বেশি করে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন আনন্দপূর্ণ সহচর; প্রধানত সাহিত্য বিষয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে কথা বলতে পারতেন। তার কণ্ঠের আবৃত্তি ছিল উপভোগ্য। বিশেষ করে নিজের কবিতা আবৃত্তির সময় মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি সুস্বল্প হাস্যরস সৃষ্টিরও ক্ষমতা ছিল তাঁর। শেক্সপিয়ার এবং আলেকজান্ডার পোপ-এর কবিতার প্রতি ছিল গভীর অনুরাগী। কবি হিসেবেও তিনি ছিলেন দ্বৈতসত্তার অধিকারী। সেদিক থেকে তিনি আদর্শবাদী ও দ্রষ্টা। হৃদয়সংবেদ্যতা এবং কল্পনাপ্রতিভা—এই দুইদিক থেকেই আদর্শের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। নারীর সৌন্দর্য এবং লাভণ্য তার সংবেদনশীল হৃদয়কে

উজ্জীবিত করত । এই উজীবন থেকেই তাঁর অনেক সংরাগময় কবিতার সৃষ্টি। কবিতা হেলেনের প্রতি, এনাবেল লি, ইলেওনোরা এই রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গল্পগুলোতে প্রেমাস্পদের প্রতি স্মৃতির ভাষা কাব্যিক এবং গীতিকাব্য ধারার। ইসরাফেল-এ তাঁর কল্পনাপ্রতিভা আমাদেরকে বাস্তব পৃথিবী থেকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নলোকে। পো-এর শেষদিককার রচনার ধরন ছিল পূজারির দেবস্মৃতির মতো।

পো-এর দ্য ভ্যালি অব আনরেস্ট, লেনার, দ্য ব্ল্যাডেন, ফর অ্যানি এবং উলালিউম ইত্যাদি কবিতায় এবং সাধারণভাবে গদ্যে রহস্যময়ত, অনুভূতিময়তা এবং আতঙ্ক খুব পরিচিত কৌশলে প্রতিভাত হয়েছে। এইসব অনুষ্ঙ্গ থেকে তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন চমকপ্রদ মৃত্যুর গল্প (দ্য ফল অব দ্য হাউস অব আশার, দ্য মাস্ক অব রেড ডেথ, দ্য ফ্যাক্টস ইন দি কেস অব ভাল ডিমার, দ্য প্রিম্যাচিওর বেরিয়াল, দ্য ওভাল পোট্রেট ও শ্যাডো), নিবুদ্ধিতা এবং অপরাধের গল্প (বেরেনিস, দ্য ব্ল্যাক ক্যাট, উইলিয়াম উইলসন, ইম্প অব দি পরভারস, দ্যা কাস্ক অব আমনটিল্যাডো, ত্য টেল টেল হার্ট), জীবনাবসানের পরের অস্তিত্বের (লিজিয়া, মোরোলা, মেটাজোগারসেইন) এবং দুর্ভাগ্যের গল্প (দ্য অ্যাসাইনেশন, দ্য ম্যান অব দি ক্রাউন্ড) ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় ধারায় ভাগ করা যায়।

পো জীবনের প্রতি মুহূর্তের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণজাত বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন অনন্যসাধারণ ভাষারীতিতে; দীর্ঘ বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের ঘটনা বা অবস্থার যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে পো-এর লেখা প্রধান প্রধান গল্পগুলো বিভীষিকাময়, উদ্ভট আর বিস্ময়কর এক ভুবন সৃষ্টি করে। তবে নিছকই বিভীষিকাময় অনুভূতির ভুবন নয় তা; মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক বাস্তবতার তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকেই এর সৃষ্টি। কোনো কোনো গল্প তো রীতিমতো গভীর নৈতিক দায়িত্বশীলতার অনুভূতি থেকেই উদ্ভূত। এ প্রসঙ্গে দ্য ফল অব দি হাউস অব অ্যাশার-এর কথা উল্লেখ করা যায়। গল্পটি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রডারিক আর ম্যাডেলিন আশার—দুই যমজ ভাই-বোনের গল্প এটি। বোন ম্যাডেলিন অসুস্থতার চরম অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়বার পর ভাই রডারিক তাকে মৃত ভেবে অন্ধকার এক কুঠুরিতে রেখে আসেন! এখানে রিডারিক অতিসূক্ষ্ম ধীসত্তার (Overfined intellect) প্রতীক। আর ম্যাডেলিন অবদমিত সহজ জীবসত্তার (Suppressed vital self) প্রতীক। এই গল্পটি এবং এই ধরনের গল্প মোরোলা এবং লিজিয়ার মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে মানুষের জীবসত্তা (Vital) আর বুদ্ধিসত্তার (intellect) দ্রবণই হচ্ছে মানবজীবন। একটাকে ধ্বংস না করে অন্যটাকে নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উইলিয়াম উইলসন গল্পের নায়ক উইলিয়াম উইলসন তার অনুরূপ চেহারার বন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে নিজের বিবেককেই ধ্বংস করেছে। টেল টেল হার্ট দ্য ব্ল্যাক ক্যাট, দ্য ইম্প অব দি পরভার্স প্রভৃতি গল্পের বর্ণনাকারী প্রথমে হত্যাকাণ্ড করেছে এবং পরে তা স্বীকার করেছে। দ্য কাস্ক অব আমানটিল্যাডো এবং হিপ-ফ্রগ গল্পের উপজীব্য প্রতিশোধপরায়ণের হত্যাকাণ্ডে । এডগার অ্যালান পো-সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র

অগাস্ত দুপৌঁ শার্লক হোমসের প্রথম পূর্বসূরি। অগাস্ত দুপৌঁকে নিয়ে লেখা দ্য মোর্ডারস ইন দি রু। মার্গ চোরাই চিঠি এবং মারি রোগেতের রহস্য বিখ্যাত গল্প। মাত্র এই তিনটি গোয়েন্দা গল্প লিখেই তিনি বিশ্বের প্রথম গোয়েন্দাগল্পের জনক। দুপৌঁর কল্পনাপ্রতিভা এবং ততোধিক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা অপরাধী সন্ধানের সক্ষম অস্ত্র।

সাংবাদিকতা পেশার গভীর প্রভাব ছিল পো-এর সমালোচনা-সত্তায়। তিনি অনুভব করতেন পত্রপত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলো হওয়া উচিত সাড়াজগানিয়া; তাঁর নিজের ভাষায়: “স্বল্পভাষ্য, ঘনবদ্ধ, সুনির্দিষ্ট অথচ সাবলীলভাবে বিস্তৃত। (The curt, the condensed, the pointed, the readily diffused)’

১৮৪৪ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত পো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেশকিছু সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত ছড়ানো-ছিটানো আলোচনা ও চিঠিপত্রে মানুষের স্বভাব, সমাজ, গণতন্ত্র, সমাজসংস্কার এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ধারণাগুলো বাঙ্ঘয় হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ প্রবন্ধ ইউরেকা (১৮৪৮)-তে তিনি চেষ্টা করেছেন বিশ্বরহস্য উন্মোচন করতে। পৃথিবীর উৎপত্তি, সমৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ এবং এর বিলয় নিয়ে তাঁর ভাবনাসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন এই প্রবন্ধে। এই রচনাটি থেকে বস্তু সম্পর্কে তাঁর কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মা, মহাশূন্য এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর অনুভবের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে বক্তৃত্য হিসেবে উপস্থাপিত ও পরবর্তীতে প্রবন্ধাকারে ১৮৫০ সালে প্রকাশিত তার দ্য পোয়োটিক প্রিন্সিপল-এ কাব্য সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তার পরিচয় মেলে। ন্যাথানিয়েল হথর্নের ছোটগল্প ‘টুয়াইস টেলিড টেলস’ সম্পর্কে লিখিত সমালোচনা প্রবন্ধে মৌলিকত্বের প্রকৃতি, প্রতীক এবং ছোটগল্প সম্বন্ধে পো-এর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থাভাবের তাড়নায় এবং সাংবাদিকতা পেশার কারণে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা ভরাতে গিয়ে অনেক গল্প লিখতে হয়েছে বলে Magazinst গল্প-লেখক হিসেবে নিন্দাও জুটেছে তার ভাগ্যে। কিন্তু সাময়িকপত্রের প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ছোটগল্পের কলারীতি’ কী হওয়া উচিত। তিনি অনুভব করেছিলেন ‘বিশেষ একটা ঘটনাকে নির্বাচন করে’ সেই ঘটনার একটা তাৎপর্য “নির্ধারিত পরিসরে আরোপ করতে সক্ষম হলে বাঙ্ঘিত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। যে শিল্পরূপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন প্রয়োজন থেকে, পরবর্তীতে তা-ই হয়ে উঠেছিল। ছোটগল্পের সংজ্ঞা। ন্যাথানিয়েল হথর্ন সম্পর্কিত রচনায় তিনি বলেছেন:

"A skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his thoughts to accommodate his incidents; but having conceived, with delibarate care, a certain unique or single effect to be wrought out, he

then invents such incidents-he then combines such events as may best aid him in establishing this preconceived effect."

নিপুণ শিল্প-সৃষ্টি গল্প নির্মাণ করেন। বুদ্ধিদীপ্ত লেখক তাঁর উপলব্ধিকে ঘটনার উপযোগী করে প্রয়োগ করেন না; বরং ঘটনাগুলোকে সযত্নে যথার্থভাবে অনুধাবন করে নিজের ভেতরে অন্য এক বোধের জন্ম দেন এবং তাঁর শিল্পকর্মে এই বোধেরই প্রকাশ ঘটান, এই বোধকে প্রকাশের জন্য তিনি উপযোগী ঘটনার সন্ধান করেন এবং এই ঘটনার সুচারু বিন্যাস তাঁর উপলব্ধ বোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন— এভাবেই গুণী শিল্পী নির্মাণ করেন গল্প]

বলা চলে পো-এর এই মন্তব্যই ছোটগল্পের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত সূত্র। এডগার অ্যালান পো বিশ্বাস করতেন আদর্শ সাহিত্য-সমালোচককে হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণপ্রবণ এবং প্রয়োজনে অবলীলায় নেতিবাচক। তিনি মনে করতেন সমালোচনার উপজীব্য হচ্ছে সৌন্দর্যের গুণগত মান অনুসন্ধান করা; ইতিহাস রচনা, জীবনী বর্ণনা বা দার্শনিকতার সন্ধান করা নয়। ডিডাকটিভ হেয়ারইজি-তে তিনি বলতে চেয়েছেন যে সৌন্দর্যের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক নৈতিকতা বা উপদেশ কখনোই তুলনীয় নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন। কবিতায় সত্য এবং ঘটনা কেবলমাত্র প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে পারে; কবিতায় এদের স্থান হতে পারে পরোক্ষ ও ইঙ্গিতময়; ব্যাখ্যাত অবস্থায় নয়। দ্য ফিলসফি অব কমপোজিশন-এ তিনি বলেছেন কবিতার সৃষ্টি হয় একমাত্র বিশুদ্ধ অনুপ্রেরণা থেকে; তাঁর ভাষায়: “এক ধরনের উত্তেজনা” থেকে। কিন্তু সৃজনশীলতার অভিযাত্রার ওপর কবির সচেতন নিয়ন্ত্রণকে তিনি খুবই গুরুত্ববহ বিষয় বলে মনে করতেন।

অধর্মণ লেখক-কবিদের মধ্যে শার্ল বোদলেয়ার, আলফ্রেড লর্ড টেনিসন, ফিওদর দস্তোয়েভস্কি, স্তোফান মালার্মে এবং আর্থার কোনান ডয়েল প্রমুখ লেখকদের ওপর রয়েছে এডগার অ্যালান পো-এর রচনা ও শিল্পচিন্তার গভীর প্রভাব। বাংলাসাহিত্যের ওপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ঘটেছে জীবনানন্দ দাশ সূত্রে। জীবনানন্দের বনলতা সেন এবং অ্যালান পো-এর টু হেলেন, দাই বিউটি-এর মধ্যে সাদৃশ্য থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

‘জীবনানন্দের কোনো কোনো কবিতা অ্যালান পো-র স্থানকালাতীত’ সুন্দরচর্যার মতোই অতিক্রম করে যায় পৃথিবীদৃঢ় স্থানকালসীমা; ধূসর, বিজন, রহস্যময়, অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত জগৎ নির্মাণে উভয়ে পরস্পরের উপবর্তী।’

আহমাদ মাযহার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

ভ্যালডিমারের মৃত্যু

মঁশিয়ে ভ্যালডিমারের মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে যে বেশ একটা কানাকানির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমি একটুও অবাক হইনি। যদি তা না হত, তাহলেই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার হত। এ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের কয়েকজনের মধ্যে আগে থাকতেই এমন একটা বোঝাপড়া ছিল যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে অন্তত আরো খোঁজখবর না নেয়া পর্যন্ত এটাকে আগাগোড়া চেপে রাখতে হবে। কিন্তু এভাবে গোপন করার ফল হল এই যে, অতিরঞ্জিত আর বিকৃত হয়ে ঘটনাটি সর্বসাধারণ্যে এমনি আকারে প্রচারিত হল যাতে সবাই এটাকে স্বাভাবিকভাবেই একেবারে অবিশ্বাস্য বলে মনে করতে আর এতটুকু দ্বিধা করল না।

তাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে এখন আসল কথা প্রকাশ করা দরকার। অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু জানি ঠিক ততটুকুই সংক্ষেপে বলে যাব।

গত তিন বছর থেকে ‘সম্মোহন বিদ্যা’ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই মাথা ঘামাতাম। প্রায় ন-মাস আগে হঠাৎ এ বিষয়ে বিশেষ একটা ব্যতিক্রমের ওপরে আমার নজর পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত জবিন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কোনো মানুষকে সম্মোহিত করার নজির নেই। একটা মানুষ যে মুহূর্তে মারা যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে সম্মোহিত করা যায় কি না এবং করা গেলে, সেই মানুষটির বিশেষ অবস্থার জন্যে সম্মোহনী শক্তির প্রভাব বাড়ে না কমে, এ সম্বন্ধে কারো কিছু জানা নেই। তৃতীয়ত, মৃতপ্রায় লোকটিকে সম্মোহিত করে কতদিন পর্যন্ত তার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব? আরো অনেকগুলো কথা জানবার আছে এ বিষয়ে। তবু মোটামুটি এই প্রশ্ন কটিই আমাকে কৌতুহলী করে তুলেছিল। বিশেষ করে ওই সম্মোহনের দ্বারা কোনো আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যুকে সত্যিই ঠেকিয়ে রাখা যায় কি না বা গেলেও কতদিনের জন্যে তা সম্ভব, এ প্রশ্নটাই বিশেষ করে আমাকে কৌতুহলী করে তুলেছিল। ব্যাপারটির সম্ভাব্য বিশেষ প্রতিক্রিয়াটুকুর কথা ভেবেই এতটা কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি।

এ বিষয়ে আমার অনুসন্ধিৎসাকে পরখ করে দেখা দরকার। কিন্তু কার ওপর সে পরীক্ষা চালানো যায়? ভাবতে ভাবতে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। ইনি ‘বিবলিওথেকা ফরেনসিকা’র সম্পাদক এবং পোল ভাষার ‘ওয়ালস্টোন’ ও ‘গারগানতুয়ার বিখ্যাত লেখক এম. আর্নেস্ট ভ্যালডিমার। ভ্যালডিমার ১৮৩৯ সাল থেকে নিউইয়র্কের ‘হারলেম’—এ বাস করছেন। অত্যন্ত রোগা শরীরটার জন্যেই তার দিকে নজর পড়ে বেশি। দেহের নিচের অংশটুকু অনেকটা জন র্যানডল্ফের মতো। ধবধবে শাদা দাড়ি, আর তার ঠিক উল্টো— মাথাভরা কুচকুচে কালো চুল। প্রায়ই ডুল হয়, তিনি বুঝি মাথায় পরচুলা পরে আছেন। তিনি যে অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির লোক তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। সম্মোহিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি যে উপযুক্ত পাত্র তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। এর

আগে দু-তিনবার খুব সহজেই আমি তাকে সম্মোহিত করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু তার অন্যান্য কয়েকটি প্রতিক্রিয়ায় আমি হতাশ হয়েছি। বলাবাহুল্য আমাকে এভাবে যে হতাশ হতে হবে তা তাঁর অদ্ভুত দৈহিক গঠন দেখে আগে থাকতেই আমার আন্দাজ করার কথা ছিল এবং আমি তা করেছিলামও। যতবারই তাকে আমি সম্মোহিত করেছি, কোনোবারই তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বা সোজাসুজি নিজের আয়ত্তে আনতে পারিনি। আমার মনে হয়, ব্যর্থতা যতটুকু ঘটেছিল তা বোধ করি তাঁর অত্যন্ত রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কয়েক মাস আগে তার চিকিৎসকরা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যক্ষ্মারোগে ভুগছেন। রোগটা তার বেশ পেকেও উঠেছে। তবু, তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শান্তভাবেই নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা বলতেন। এর জন্যে তাঁকে দুঃখ করতে বা মৃত্যুকে ঠেকাবার বিষয়ে কোনো কথা বলতে শুনিনি কোনোদিন।

তাই আমার কৌতুহলের বিষয়টিকে কার্যকর করার ব্যাপারে চিন্তা করতেই যে প্রথমে ভ্যালডিমারের কথাই আমার মনে পড়ে যাবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

পার্থিব জীবন সম্বন্ধে লোকটির ধারণা যে কী তা আমার ভালো করেই জানা ছিল। তাই তার দিক থেকে এ বিষয়ে যে কোনো বাঁধাই আসবে না তা আমি জানতাম। আর আমেরিকায় তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না যে, তারা কোনোরকম বাধা দেবে। বেশ খোলাখুলিভাবেই এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলাম এবং আমার কথা শুনে তার আগ্রহদীপ্ত আর উত্তেজিত ভাব দেখে আমি আশ্চর্যই হলাম। আশ্চর্য হলাম, কারণ এর আগে তিনি বহুবারই আমার এই ধরনের পরীক্ষার কথা শুনে নিজের দেহটাকে আমার গবেষণার বিষয়বস্তু করতে দিতে দ্বিধা করেননি। তবু, এর আগে আমার কোনো কাজের প্রতি তাঁর কোনো আন্তরিক সহানুভূতি দেখিনি। কিন্তু এবার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখা গেল। তাঁর অসুখটা এমনি এক ধরনের যে আগে থাকতেই হিসাব করে প্রায় ঠিক-ঠিক বলে দেয়া যায়—কবে, কোন সময়ে এটা চরম অবস্থায় পৌঁছে মৃত্যুকে ডেকে আনবে রোগীর শিয়রে। ভ্যালডিমারের সাথে আমার কথা হল যে, তার চিকিৎসকরা ঠিক যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে বলে ঘোষণা করবেন তার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

আমাদের এ কথাবার্তার সাত মাস পরের ঘটনা। একদিন ভ্যালডিমারের নিজের হাতে লেখা ছোট্ট একটা চিঠি পেলাম।

প্রিয় পি—

এখন আপনি আসতে পারেন। ডি— ও ফা— দুজনই একমত হয়েছেন যে, আমি কোনোমতেই আগামীকাল মাঝরাতের পর আর বেঁচে থাকতে পারি না। আমার মনে হয়। সময়টা তারা প্রায় ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

- ভ্যালডিমার

দশ-বারো দিন আগে অবশ্য ভ্যালডিমারকে দেখে এসেছিলাম। তবুও চিঠিটি লেখার আধঘণ্টার মধ্যে সেটা পেয়েই পনেরো মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুপথযাত্রী ভ্যালডিমারের শিয়রে এসে দাঁড়ালাম। মাত্র দশটা দিন তাকে দেখিনি। এই কটা দিনের মধ্যেই তার ভয়াবহ পরিবর্তন দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখদুটি নিস্প্রভ। এত শুকিয়ে গেছেন যে, গালের চামড়া ঠেলে চোয়ালের হাড়গুলো বীভৎসভাবে জেগে উঠেছে। নাড়ির স্পাদন অতি ক্ষীণ। তবুও আশ্চর্যজনকভাবে তিনি তার মানসিক, এমনকি শারীরিক শক্তিও যেন বেশকিছুটা টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। স্পষ্ট স্বরেই তিনি কথা বললেন। কিছুক্ষণ আগে নিজের হাতেই একটু বলকারক ওষুধ খেয়েছেন তিনি। ঘরে ঢুকেই দেখলাম, পকেটখাতায় পেনসিল দিয়ে রোজনামচা লিখছেন তিনি। বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বিছানাতেই বসে ছিলেন। ডাক্তার ডি— ও ডাক্তার ফা—, দুজনাই রয়েছেন।

ভ্যালডিমারের সাথে করমর্দন করে ডাক্তার দুজনকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে রোগীর অবস্থাটা জেনে নিলাম। আঠারো মাস থেকে বাঁ-দিকের ফুসফুসটা আড়ষ্ট হয়ে প্রায় হাড়ের মতো শক্ত হয়ে গেছে। দেহের শক্তি বাড়ানো বা কোনো উপকার করার মতো সেটার অবস্থা আর নেই। ডানদিকের ফুসফুসের উপরের অংশবিশেষেরও সেই একই অবস্থা। নিচের অংশ যক্ষ্মা-জীবাণুর গুটিগুটি পুঁজ পরস্পর জড়িয়ে গিয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। ফুসফুসের প্রায় জায়গাই ফুটো হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা জায়গায় জীবাণুগুলো একেবারে পাজরার হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। ফুসফুসের ডানদিকের এই অংশের যে ঘা সেটা খুব কম দিনের বলেই মনে হয়। একমাস আগেও এই অংশে রোগের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। মাত্র তিন-চারদিন আগে রোগটা এই অংশে ধরেছে বলে মনে হয়। যক্ষ্মা ছাড়াও বৃকের প্রধান রক্তবাহী শিরাগুলোও ফুলে উঠেছে বলে সন্দেহ হয়। কিন্তু ফুসফুসের আড়ষ্টতার জন্যে এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। উভয় ডাক্তারেরই মতে ভ্যালডিমার কাল রবিবার মাঝরাত নাগাদ মারা যাবেন। এটা হল শনিবার সন্ধ্যা সাতটার কথা। আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসার আগে ডাক্তার ডি— ও ডাক্তার ফা— ভ্যালডিমারের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তার দুজনার ইচ্ছে ছিল আর ভ্যালডিমারকে দেখতে আসবেন না। কিন্তু আমার অনুরোধে তারা আগের সিদ্ধান্ত বদলাতে রাজি হলেন। ঠিক হল কাল রাত দশটা নাগাদ তারা আর একবার ভ্যালডিমারকে পরীক্ষা করে যাবেন।

তঁারা চলে গেলে পর আমি ভ্যালডিমারের সাথে তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে বেশ খোলাখুলি কয়েকটা কথা বললাম। তার ওপরে আমার পরীক্ষানিরীক্ষার কথাটাই বিশেষ করে বললাম। তার কথাবার্তায় বোঝা গেল। তিনি তখনো আমার এই ধরনের কাজে শুধু যে রাজিই আছেন তা নয়, আমি যাতে তাড়াতাড়ি কাজ

করতে শুরু করি তার জন্যে তিনি বেশ তাগিদই দিতে লাগলেন। কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ব্যাপারে আমার যেন সাহসে কুলোচ্ছে না। বিশেষ করে, কে জানে কী দুর্ঘটনা ঘটে যায়! সাক্ষী থাকবার মতো লোকের দরকার। শুধু একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে নার্স ছিল ঘরের মধ্যে। তাদের ওপরে আমার তেমন ভরসা হল না। কাজে কাজেই আগামীকাল রাত আটটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষার ব্যাপারটা স্থগিত রাখাটা প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।

পরের দিন রাত আটটা নাগাদ আমার পরিচিত এক ছাত্র-ডাক্তার, মিস্টার থিয়োডোর এসে উপস্থিত হলেন। অনেকটা আশ্বাস হওয়া গেল। প্রথমটা আমার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার দুজন এলেই কাজ শুরু করা যাবে, কিন্তু ভ্যালডিমারের পীড়াপীড়িতে বেশি সময় আর নষ্ট করা সত্যিই উচিত নয় ভেবে তখুনি কাজ শুরু করার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেললাম। কারণ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ভ্যালডিমার অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

মি. থিয়োডোর আমার এই পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার ওপর এতই সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় আমার পরীক্ষাকালের সমস্ত ব্যাপার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে যেতে রাজি হয়ে গেলেন। এখন আমি যা যা বলব সে সবই তার ওই লিখিত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার এবং কোথাও কোথাও হুবহু নকল বলা যায়।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ভ্যালডিমারের হাতখানি ধরে স্পষ্ট স্বরে তাকে অনুরোধ করলাম যে, তিনি তাঁর এই অবস্থায় আমার সম্মোহন-পরীক্ষায় রাজি যে আছেন, তা যেন মি. থিয়োডোরকে জানান। অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট স্বরে তিনি উত্তর দিলেন: “হ্যাঁ আমি সম্মোহিত হতে চাই।” কথা শেষ করেই তিনি আবারো বললেন: “ভয় হয়, আপনি বোধহয় দেরি করে ফেললেন।”

তাঁর এ কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যথারীতি পাস’ (pass) দিতে শুরু করে দিলাম। এইভাবে “পাস দিয়ে তাকে আগেও আচ্ছন্ন করেছি। এরপরেও কপালের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে কয়েকবার হাত চালাতেই কিছুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে স্পষ্টই দেখা গেল। কিন্তু পরে আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার আর কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গোল না। এই একই ভাব চলল। রাত দশটা পর্যন্ত। রাত দশটায় আগের ব্যবস্থামতো ডাক্তার ডি— ও ডাক্তার ফা— এসে উপস্থিত হলেন। আমার পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি কথা বললাম। আমার কাজে বাধা দেবার মতো কোনো মনোভাব তাঁরা প্রকাশ করলেন না। তাদের মতে, রোগী এখন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছে। সম্মোহনের ফলে সেটা হয়তো কিছুটা লাঘবই হবে। বিনা দ্বিধায় কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। উপর থেকে নিচের দিকে লম্বালম্বি ‘পাস’ দিতে লাগলাম। একই সময়ে আমার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে রোগীর ডান চোখের ওপরে নিবদ্ধ রাখলাম।

রোগীর নাড়ির স্পন্দন আর প্রায় পাওয়াই যায় না। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে একরকম শাই শাই শব্দ শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত ধীরে, প্রায় আধ মিনিট অন্তর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে।

প্রায় পনেরো মিনিটকাল এমনি অবস্থাতেই কাটল। ঠিক এর পরেই স্বাভাবিকভাবে যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস রোগীর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। শই শই শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবধানের কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। রোগীর সর্বাঙ্গ হিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। রোগীর ওপরে আমার সম্মোহন শক্তির প্রভাব স্পষ্টই অনুভব করলাম। চোখে কাচের মতো স্বচ্ছ একটা ভাবের বদলে দেখলাম অদ্ভুত এক পরিবর্তন। রোগী যেন সুদূর এক দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিজের ভেতরটা নিজেই দেখছে। স্বপ্নচারী ছাড়া আর কারুর চোখের দৃষ্টি এমনি হতে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমার ভুল হয়নি, আমি নিশ্চিত। আর কয়েকটা লম্বালম্বি ‘পাস’ দিতেই রোগীর চোখের পাতা কেঁপে উঠল। অনেকটা, ঘুমুবার প্রথম চেষ্টায় যেমন কেঁপে ওঠে ঠিক তেমনিভাবেই। আরো কয়েকটা ‘পাস’ দিয়েই রোগীর চোখের পাতা একেবারে বুজিয়ে দিলাম। বলাবাহুল্য, এতক্ষণের চেষ্টায় ফল যতটুকু পাওয়া গেল তাতে আমি মোটেই খুশি হতে পারিনি। তবুও জোরে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই হাতের কৌশল চালিয়ে যেতে লাগলাম। রোগীর ঘুমন্ত দেহটাকে একেবারে শক্ত কাঠের মতো না করে দেয়া পর্যন্ত আমার ‘পাস’ চালিয়ে যেতে হল। তারপর বেশ একটা সহজ-সরল ভঙ্গিতে আড়ষ্ট দেহটাকে রেখে দেয়া হল। রোগীর পাদুটো একটা সহজ লম্বালম্বি ভঙ্গিতে রাখা হল। হাতদুটোও কোমর থেকে মাঝামাঝি দূরে লম্বালম্বিভাবে রাখা হল। রোগীর মাথাটি বিছানা থেকে সামান্য উঁচু করে দেয়া হল। এইসব ব্যবস্থা সারতে রাতদুপুর হয়ে গেল। ডাক্তারদের এবার ভ্যালডিমারের অবস্থাটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে বললাম। কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর তাঁরা স্বীকার করলেন, ভ্যালডিমার এখন সম্পূর্ণ সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছেন। ডাক্তার দুজনের কৌতুহল এখন বেশ বেড়ে উঠতে দেখা গেল। ডাক্তার ডি— তো ঠিকই করে ফেললেন রাতটা তিনি এখানেই কাটাবেন। ডাক্তার ফা— অবশ্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তবু যাবার সময়ে কথা দিয়ে গেলেন সকালে আবার আসবেন। মি. থিয়োডের আর নার্সরা সবাই রইলেন।

ভ্যালডিমারকে আমরা ঠিক এই অবস্থাতেই রেখে বেরিয়ে এলাম। প্রায় ভোর তিনটে নাগাদ আবার রোগীর ঘরে ঢুকে দেখলাম রোগী ঠিক আগের অবস্থাতেই আছেন। ডাক্তার ফা— চলে যাবার সময় তার যে অবস্থা ছিল এখন পর্যন্ত সে অবস্থার কোনো তারতম্য ঘটেনি। ঠিক একইভাবে শুয়ে আছেন তিনি। নাড়ির স্পন্দন প্রায় ধরাই যায় না। খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। এত ধীরে যে চোখে ধরা যায় না। নাকের কাছে একটা আরশি ধরলে সেটা ঝাপসা হয়ে যায়, এতেই শুধু বোঝা যায় রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস এখনো চলছে। স্বাভাবিকভাবে চোখদুটো বোজা। সর্বাঙ্গ বরফের মতো ঠাণ্ডা। দেহটা পাথরের মতো আড়ষ্ট। কিন্তু তবুও রোগীকে দেখে তাঁর মধ্যে কোথাও মৃত্যুর কোনো লক্ষণই দেখা যায় না।

ভ্যালডিমারের কাছে এসে আমার হাতটা এমনভাবে তার ওপরে চালনা করতে লাগলাম যাতে তার ডান হাতটা সেই প্রক্রিয়ার প্রভাবেই নড়াচড়া করতে পারে। এই ধরনের সম্মোহন প্রক্রিয়ায় অন্তত ভ্যালডিমারের ওপরে আগে আমি ততটা সফল হতে পারিনি। আর ভাবিনিও যে এখন তা পারব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেখলাম তার ডান হাতটা দুর্বলভাবে হলেও বেশ নিখুঁতভাবেই আমার নির্দেশমতো ওঠানামা করছে। বদ্ধপারিকর হয়ে এবার রোগীর সাথে কথা বলবার দুঃসাহস করে বসলাম।

জিগ্যেস করলাম, মঁশিয়ে ভ্যালডিমার আপনি কি ঘুমিয়ে আছেন?

কোনোই উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু অনুভব করলাম তাঁর ঠোঁটদুটো যেন একটু কেঁপে উঠল। এতে করে আরো প্রশ্ন করার উৎসাহ পেয়ে বসল আমাকে। চোখের পাতাগুলো একটুখানি ফাঁক হল। ভেতরের সাদা অংশটুকু দেখা গেল শুধু। শিথিলভাবে ঠোঁটদুটো একটু নড়ে উঠল। এই সময় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চাপা ক্ষীণস্বরে বেরিয়ে এল। ক’টি অস্পষ্ট শব্দ: ‘হ্যাঁ এখন আমি ঘুমিয়ে আছি, আমাকে জাগিও না, এমনভাবেই মরতে দাও।’ এই অদ্ভুত কথাগুলো আমরা সবাই শুনলাম। দেখলাম রোগী ঠিক আগের মতোই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছেন। শুধু তার ডান হাতটি আগের মতোই আমার সম্মোহন-শক্তির নির্দেশমতো এদিক-সেদিক নড়ছে। আবারো জিগ্যেস করলাম, ‘মঁশিয়ে ভ্যালডিমোর।’ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, কিন্তু এবার আরো অস্পষ্ট স্বর: ‘আর ব্যথা নেই, এখন আমি মরছি।’

রোগীকে এখন আর কোনো রকমেই বিরক্ত করা উচিত হবে না। ডাক্তার ফা— আসা পর্যন্ত আমি আর কিছুই করিনি। সূর্যোদয়ের কিছু আগে ডাক্তার ফা— এসে হাজির হলেন। রোগী এখনো বেঁচে আছেন দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। নাড়ি দেখে নিয়ে তিনি রোগীর নাকের কাছে ছোট একটা আরশি ধরে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করলেন। তারপর ভ্যালডিমারের সাথে আমাকে আবার কথা বলতে বললেন। আমি প্রশ্ন করলাম, ‘মঁশিয়ে ভ্যালডিমার, আপনি কি এখনো ঘুমুচ্ছেন? আগের মতোই, কয়েক মিনিট পরে উত্তর দিল রোগী, কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। মনে হল মৃত্যুপথযাত্রী রোগী যেন আপ্রাণ চেষ্টা করে কথা বলার জন্যে কিছুটা বল সঞ্চয় করছেন। আমার প্রশ্নের চারবারের বার প্রায় অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল: “হ্যাঁ, এখনো ঘুমিয়ে, আমি এখন মারা যাচ্ছি।”

ডাক্তারদের ইচ্ছেমতোই আমরা ঠিক করলাম রোগীকে আর কোনো রকমেই বিরক্ত করা হবে না। যতক্ষণ-না তাঁর মৃত্যু হয় ততক্ষণ তিনি এই সম্মোহিত, আচ্ছন্নভাবে মধ্যস্থ থাকুন। তাতে আমাদের বিশ্বাস তিনি শান্তিতেই মরতে পারবেন। আমরা সবাই একমত, রোগী আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মারা যাবেন। যাই হোক, শেষবারের মতো রোগীকে আর একটিবার প্রশ্ন করব ঠিক করলাম। আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলাম মাত্র।

কথা বলতেই ভ্যালডিমারের আকৃতিতে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। চোখদুটো একটু নড়ে উঠে ধীরে ধীরে খুলে গেল। মণিদুটো উল্টে গেল,

মণির দ্যুতি অত্যন্ত ক্ষীণ ও নিস্প্রভ। দুই চোয়ালের তোবড়ানো দাগগুলো যেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। এ পরিবর্তনটুকু খুবই আকস্মিক। উপরের ঠোঁটটা এক মুহূর্তের জন্যে ফাঁক হয়ে উপরে একটু উঠে গেল। মৃদু একটা ঝাঁকুনির শব্দ করে নিচের চোয়ালটা ঝুলে গিয়ে মুখটা হাঁ হয়ে গেল। তার মধ্যে থেকে পরিষ্কারই দেখা যায়, ফোলা কালো জিভটা মুখে যেন এঁটে বসে গেছে। ঘরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কারুরই হাসপাতালে রোগীদের মরবার সময়কার ভয়ঙ্কর অবস্থা স্বচক্ষে দেখার কোনোরকম অভিজ্ঞতারই অভাব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভ্যালডিমারের এ সময়কার বিকট চেহারা দেখে প্রায় সবাই সভায় রোগীর বিছানার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

আমার মনে হচ্ছে, এই পর্যায়ে আমার বিবৃতির এমন এক জায়গায় আমি এসেছি যেখানে অনেকেই এবার আমাকে বেশ অবিশ্বাস করতে শুরু করবেন। তবু আমি নেহাত সাদাসিধেভাবেই ঘটনাটি বলে যাব।

মঁশিয়ে ভ্যালডিমারের দেহের মধ্যে আর ক্ষীণতম জীবনীশক্তিরও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। রোগী মারা গেছেন ধরে নিয়ে আমরা মৃতদেহটির ভার নার্সদের ওপর ছেড়ে দেব ঠিক করছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম রোগীর জিভটা খারখার করে কাঁপছে। প্রায় এক মিনিটকাল এইভাবে জিভটা খারখার করে কাঁপতে লাগল। পরীক্ষণেই ঝুলে পড়া চোয়ালের মধ্য থেকে এমন এক ভয়ঙ্কর শব্দ বেরিয়ে এল যে, সে শব্দের বর্ণনা করতে যাওয়াও বোকামি। যে শব্দটি উচ্চারিত হল তাকে মোটামুটি তিনটি অংশের বা শব্দের সমষ্টি বলা যায়। অত্যন্ত কর্কশ, ভাঙা আর বাজাখাই শব্দকটি একসঙ্গে এমনভাবে আমাদের কানে এসে পৌঁছল যে, মনে হল এই ধরনের বিকট শব্দ, এই বীভৎস স্বরধ্বনি কোনোকালে কোনো মানুষের কানে এসে বাজেনি। বীভৎস শব্দের মধ্যে উচ্চারণভঙ্গির এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল, একমাত্র অপার্থিব কোনোকিছুর সাথেই যে বৈশিষ্ট্যের তুলনা চলে। স্বরটা মনে হল অনেক দূর থেকে বা মাটির নিচের কোনো গভীর গর্তের মধ্য থেকে কানে এসে পৌঁছল।

এই শব্দ এবং স্বর, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটা পাঠক নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন আমার আগেকার কথা থেকে। শব্দটা স্পষ্ট, আশ্চর্য রকমে স্পষ্ট। একসঙ্গে জড়িয়ে কানে এসে বাজলে শিউরে উঠতে হয়। কিছুক্ষণ আগে আমি যে প্রশ্ন করেছি, তার জবাবেই ভ্যালডিমার ওই শব্দ করছেন। তাকে জিগ্যেস করেছিলাম, আপনি কি এখনো ঘুমুচ্ছেন?” এখন সে প্রশ্নের উত্তর এল: “না। আমি ঘুমিয়েছিলাম, এখন আমি মৃত।”

এই কাটি মাত্র কথায় যে কী সাংঘাতিক অব্যক্ত এক বিভীষিকায় সবাই শিউরে উঠতে বাধ্য হয়েছিল তা অস্বীকার করবার জো নেই। না শিউরে উঠে উপায় ছিল না। থিয়োডোর তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েই গেলেন। নার্সরা দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। তাদের কোনোমতেই আর ফিরিয়ে আনা গেল না। আমার নিজের অবস্থা যে কী তখন, তা পাঠককে আর নাই বা বুঝিয়ে বললাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নিঃশব্দে আমরা মি. থিয়োডোরের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। তার জ্ঞান ফিরে এলে আমরা আবার ভ্যালডিমারের অবস্থাটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করলাম। ভ্যালডিমারের অবস্থা ঠিক হবছ আগের মতোই রয়েছে। শুধু এইটুকু তফাত যে, এখন আর তার নাকের কাছে আরশি ধরলেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো লক্ষণ বোঝা যায় না। রোগীর হাত থেকে একটুখানি রক্ত বার করে দেখবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। আরো উল্লেখযোগ্য, আগের মতো আমার সম্মোহন-নির্দেশে রোগীর হাতটা আর ওঠানামা করছে না। এ বিষয়ে বৃথাই কয়েকবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু হাতটা একটুও নড়ল না। আমার প্রশ্নের সময় শুধু দেখা যায়, মৃতদেহের কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন না হলেও মৃতের মুখের মধ্যে জিভটা শুধু কাঁপতে থাকে। মৃতদেহের ওপর আমার সম্মোহন শক্তির এইটুকুই একমাত্র প্রতিক্রিয়া যা এখনো সক্রিয়। মনে হয়, ভ্যালডিমার যেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তির অভাবেই পেরে উঠছেন না। অন্য কেউ কোনো প্রশ্ন করলে মৃতদেহ বা তার জিভে কোনো বিকারই দেখা যায় না। এমনকি, প্রশ্নকর্তাদের প্রত্যেককে এক-একবার সম্মোহন-প্রভাবের মধ্যে এনে তাদের দিয়ে প্রশ্ন করানো হল কিন্তু মৃতের সাড়া দেয়ার কোনোই লক্ষণ নেই।

আমার মনে হয়, ভ্যালডিমারের বর্তমান অবস্থাটা পাঠককে বোঝানোর জন্যে যা যা বলা দরকার তার সবই আমি বলতে পেরেছি। অন্য কয়েকজন নার্স জোগাড় করা হল। দশটার সময় ডাক্তার দুজন ও মি. থিয়োডোরকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

বিকেলবেলা আমরা সবাই আবার রোগীকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা দেখলাম মোটামুটি আগের মতোই। রোগীকে অতঃপর জাগানো সম্ভব কিনা বা আদৌ সেটা যুক্তিযুক্ত কিনা— সে বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলাম। কিন্তু রোগীকে আর জাগিয়ে কোনো ফল হবে না। আমরা স্পষ্টই অনুভব করলাম, সাধারণত মৃত্যু বলতে যা বোঝায় সেটা সম্মোহন শক্তির প্রভাবেই যেন স্থগিত হয়ে আছে। রোগীকে আর একবার জাগাতে পারলে লাভ হবে এইটুকু যে তিনি তাড়াতাড়ি মরে যাবেন।

প্রায় সাত মাস পরের ঘটনা। এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক দিনই আমরা ভ্যালডিমারের ওখানে গিয়ে তাঁকে দেখে আসছি। অনেক বন্ধু ও ডাক্তার সেখানে ভিড় করেছেন। সব সময়েই আমরা দেখেছি রোগী ঠিক আগের অবস্থাতেই আছেন, এতটুকু পরিবর্তন নেই। নার্সরা সব সময়েই রোগীর আশেপাশেই আছে।

গত শুক্রবারে শেষপর্যন্ত আমরা ঠিক করলাম, রোগীকে শেষবারের মতো জাগানো হবে বা জাগাবার চেষ্টা করা হবে। বলাবাহুল্য, আমাদের এই শেষচেষ্টার ফলাফল দুর্ভাগ্যজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তা নিয়ে তুমুল আলোচনার ঝড় উঠল— যাকে একান্ত অযাচিত বলা ছাড়া উপায় নেই।

মঁশিয়ে ভ্যালডিমারকে সম্মোহন প্রভাব থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমরা তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। প্রথমত ‘পাস’ দিতে শুরু করা গেল। কিছুক্ষণ ধরে এতে কোনোই ফল পাওয়া গেল না। পরীক্ষণেই সম্মোহনের ক্রিয়া প্রথম প্রকাশ পেল। এতক্ষণ চোখদুটোর শুধু সাদা অংশটুকুই দেখা যাচ্ছিল। এবার ধীরে ধীরে চোখের মণিদুটো নড়ে ওঠার ফলে চোখের পাতার মধ্যে থেকে হলদে রঙের বিশ্রী দুর্গন্ধযুক্ত একটা জলীয় জিনিস হাড় হাড় করে বেরিয়ে এল।

সবাই বললেন, আগের মতো আমার ইচ্ছাশক্তির জোরে রোগীর হাতটাকে নড়াবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এতে কোনোই ফল পাওয়া গেল না। ডাক্তার ফা — চাইলেন রোগীকে কোনো প্রস্ন করি। তাঁর কথামতোই ভ্যালডিমারকে জিগেস করলাম, “মঁশিয়ে ভ্যালডিমার, এখন আপনি কেমন বোধ করছেন বা আপনার কি কিছু বলবার আছে?”

সঙ্গে সঙ্গে গলার উপরকার সেই তোবড়ানো দাগগুলো আবার জেগে উঠল। জিভটা খরখর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু চোয়াল আর ঠোঁটদুটো এখনো তেমনি শক্ত। একটু পরে সেই ভয়ানক কণ্ঠস্বর আবার সবাইকে শিউরে দিল: “ঈশ্বরের দোহাই, শিগগির করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, না-হয় তো এখুনি আমাকে জাগিয়ে দাও। এখুনি, এখুনি। আমি বলছি, আমি এখন মৃত।”

একমুহূর্তের জন্যে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। প্রথমে চেষ্টা করলাম রোগীকে আগের অবস্থাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির আর কোনোই লক্ষণ দেখতে না পেয়ে আবার রোগীকে ভালো করেই জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলাম। মনে হল, আমার এই চেষ্টায় নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যাবে। রোগীকে এখুনি যে জাগিয়ে তোলা যাবে তাতে আমার কোনোই সন্দেহ ছিল না। মৃতকে এখুনি জেগে উঠতে দেখা যাবে, ঘরের সবাই যেন মনে মনে প্রস্তুত ছিল এ দৃশ্য দেখবার জন্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা ঘটল। তার জন্যে কোনোকালে কোনো মানুষই বোধহয় তৈরি ছিল না।

খুব তাড়াতাড়ি ‘পাস’ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা অমানুষিক শব্দ রোগীর জিভের ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে এল— ঠোঁটের ভেতর থেকে নয়: ‘মৃত, মৃত!’ সঙ্গে সঙ্গে একমুহূর্তের মধ্যে কি তার চেয়েও কম সময়ের ভেতর রোগীর সমগ্র দেহটা, কঁকড়ে, ভেঙে দুমড়ে আমার হাতের তলতেই পচে, গলে খসে পড়ল। আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে সবাই দেখল বিছানার উপর পড়ে আছে উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত গলিত মাংসপিণ্ডের একটা স্তুপ।

লাল মড়ক

সে অনেকদিন আগেকার কথা। রক্তমুখী মড়ক দেশটাকে শ্মশান করে দিয়েছিল। এর আগে কোনো মহামারীই এত মারাত্মক, এত ভীষণভাবে দেখা দেয়নি। রক্তই এ মড়কের দূত। রক্তের বিভীষিকা আর টকটকে তাজা রক্তই এর শেষ পরিণতি। হঠাৎ মাথাঘোরা ভাব, তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা, তারপর পচনের সাথে সাথে দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে প্রচুর রক্তপাত। রোগীর সারা দেহে, বিশেষ করে মুখের উপর এমন একটা রক্তাক্ত ভাব ফুটিয়ে তোলে যার আভাসমাত্রেরই কেউ আর রোগীর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। আত্মীয়-পরিজনের এতটুকু সহানুভূতি বা সেবায়ত্ত পাবার আর কোনোই পথ থাকে না। অসুখের আবির্ভাব, বিস্তার আর আধঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ— এই হল এই রোগের সার্বিক বৃত্ত।

যুবরাজ প্রসপ্যারো বলতে গেলে বেশ সুখীই ছিলেন। তিনি দুর্জয় সাহসী আর দূরদর্শী। তার রাজ্যের অর্ধেক লোক যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন তিনি তার পরিষদ ও তাদের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে থেকে এক হাজার সুস্থ-সবল আমুদে বন্ধুবান্ধবকে তলব করলেন। তারপর তাদের নিয়ে তিনি তাঁর এক নিরিবিলি দুর্গপ্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। দুর্গটি বিরাটাকার ও গঠননৈপুণ্যে সত্যিই চমৎকার। এটি তাঁর খেয়ালি অথচ সুরুচিসম্পন্ন ঘরের মতো করেই তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। বিরাট উঁচু ও মজবুত একটা দেয়াল দুর্গটিকে ঘিরে রেখেছে। দেয়ালের মধ্যে বিরাট সব লোহার দরজা। পরিষদরা সবাই ভেতরে এসে গেলে দরজাগুলোয় লোহার বড় বড় পেরেক মেরে সেগুলোকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হল। এতে করে এই হল যে, বাইরে আসা বা ভেতরে যাওয়ার ঝামেলা চুকে যাওয়ায় দুর্গের মধ্যে কারুর মনে কোনো আতঙ্ক বা চাঞ্চল্য সৃষ্টির আর উপায় রইল না। দুর্গটির মধ্যে খাওয়াদাওয়ার যাবতীয় ব্যাপারে সুচারু বন্দোবস্ত করা হল। এইভাবে বাইরের রোগ, সেই লাল মড়ক যে আর কোনোমতেই ভেতরে সংক্রমিত হতে পারবে না। সে বিষয়ে যুবরাজ ও পারিষদরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন। বাইরের লোকেরা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করুক। তাদের কথা ভাববার অবকাশ কোথায়! এমন একটা সময়ে ও ধরনের চিন্তা বা শোক করা সত্যিই বোকামি। যুবরাজ আমোদপ্রমোদের যা কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব তার সবই করেছিলেন। বিদূষক, ভাঁড়, কবিয়াল, নর্তকী, গায়ক, সুন্দরী তন্মী আর সর্বোপরি মদ, কোনোকিছুরই অভাব ছিল না সেখানে। আমোদ-প্রমোদের এত সরঞ্জাম আর সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যকার এই নিরাপদ আশ্রয় এর চেয়ে কাম্য আর কী হতে পারে। বাইরে তখন লাল মড়কের ধ্বংসতাণ্ডব!

পাঁচ-ছ'মাস পরের কথা। বাইরে তখন লাল মড়কের ধ্বংসলীলা সমানে চলেছে। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। আর একই সময়ে সুরক্ষিত দুর্গের

মধ্যে যুবরাজ তার সাজোপাঙ্গদের নিয়ে অস্বাভাবিক জাকজমকপূর্ণ আমোদ-উল্লাসে অতিবাহিত করছেন তার দিন।

চলছে মুখোশনাচের আসর। কিন্তু তার আগে আমি এই নাচের মজলিশ যেখানে চলছিল। সেই ঘরগুলোর একটু পরিচয় দেব। রাজকীয় আবাস হিসেবে যে অংশটুকু এই বিরাট দুর্গের মধ্যে নির্দিষ্ট করা ছিল সেটাতে মোট সাতটি ঘর। অনেক প্রাসাদেই এই ধরনের কয়েকটি ঘর মিলিয়ে বেশ একটা মহলের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঘরগুলো সার-বাধা আর পাশাপাশি। প্রত্যেকটি ঘরের ভাঁজকরা দরজাগুলোর পাল্লা এমনভাবে খুলে দেয়ালের গায়ে মিশে যায় যে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরের মধ্যকার সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এছাড়াও এখানে আরো একটু স্বতন্ত্র ধরনের ব্যবস্থা ছিল। সব বিষয়েই যুবরাজের একটা স্বতন্ত্র খাপছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘরগুলোর গঠনস্বাতন্ত্র্য আর কিন্তুত পারিপাটে এ কথা বেশ ভালোভাবেই প্রমাণিত। ঘরগুলো এমনি খাপছাড়াভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, একটা থেকে আর একটা ঘরের কিছুই দেখা যায় না। বিশ কি ত্রিশ গজ অন্তর এক-একটি বাঁক আর একটি বাঁক কাটিয়ে অন্যটিতে গেলে দেখা যাবে ঘরের রঙ থেকে আসবাব পর্যন্ত আমূল বদলে গেছে। ডাইনে, বাঁয়ে এবং দেয়ালের মধ্যখানে একটা করে দীর্ঘ অপরিসর জানলা। গথিক আকারের এই জানলাগুলোর মধ্য দিয়ে তাকালে সম্মুখে দেখা যাবে লম্বা একটা বারান্দা। ঘরগুলোর প্রত্যেকটি বাঁক এই বারান্দায় এসে মিশেছে। জানালাগুলোয় রঙিন কাঁচ দেয়া। এক-একটা জানালা এক-এক রঙের। ঘর আর আসবাবপত্রের রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে সেই ঘরের জানালাগুলোর রঙ করা হয়েছে। যেমন, পুর্বদিকের শেষ ঘরটার রঙ নীল। এ ঘরের জানালাগুলোও নীল। তাদের কাচও নীল। তার পাশের ঘরের রঙ ধোঁয়াটে। ঘরের ভেতরে লতাপাতার ছবি আঁকা পরদা, আসবাবপত্র, মায় জানালার চৌকাঠ পর্যন্ত ধোঁয়াটে রঙের। তৃতীয়টিও এইভাবে আগাগোড়া সবুজ। চতুর্থটি কমলা রঙের। পঞ্চম ঘরটা আগাগোড়া সাদা। ষষ্ঠ ঘরে সবকিছুই বেগুন। সপ্তম ঘরে ভারি কালো রঙের পর্দাগুলো ভাজ ভাঁজ হয়ে মেঝেতে যে কার্পেটটির উপর নেমে এসেছে তার রঙও কালো। এই একটিমাত্র ঘর, যার মধ্যকার জানালার রঙ ঘরের আসবাবপত্রের রঙের সঙ্গে মেলেনি। জানালার চৌকাঠ রক্তবর্ণ। সব ঘরের মধ্যে চারদিকেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সোনালি জিনিসপত্র। (দু-একটা ঝাড়বাতিও বুলছে ছাদ থেকে। এগুলোর মধ্যে একটি দীপাধার। এই একটিমাত্র ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরেই কোনো দীপাধার নেই।) কোনো ঘরে আলো নেই বটে, কিন্তু বারান্দার দিকে প্রত্যেকটি ঘরের যে একটি করে জানালা, তার প্রত্যেকটির সামনে ভরি তেপায়া টুলের উপর একটা করে বাতি রাখা হয়েছে। মশালের মতো উজ্জ্বল আলো জানালার রঙিন কাঁচ ভেদ করে ঘরগুলোকে নানা রঙের আলোতে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। এর ফলে ঘরগুলোর মধ্যে বিরাট এক জাঁকালো অথচ স্বপ্নাচ্ছন্ন রহস্যময়তা নেমে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমদিকের কালো

ঘরটার রক্তের মতো লাল জানালা দিয়ে বাইরের আলো রক্তবর্ণ চৌকাঠের উপর পড়ে এক বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করে রেখেছে। যে কেউ এ ঘরে ঢুকুক না কেন, তার সারাশরীরের উপর এই বীভৎস রক্তাক্ত আলো পড়বে, চেহারা দেখাবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাই কেউ-ই পারতপক্ষে এ ঘরের মধ্যে পা বাড়াতে সাহস করে না।

ঘরটার পশ্চিমদিকের দেয়ালে বিরাট একটা দেয়ালঘড়ি। বড় পেঙ্গুলামটা একঘেঁয়ে চাপা শব্দে টিকটিক করে বেজে চলেছে। মিনিটের কাঁটাটা একবার চারদিক ঘুরে এলে যখন ঘন্টার বাজনা শুরু হয়, ঠিক তার আগে ঘড়িটার পেতলের গহ্বর থেকে অদ্ভুত এক ধ্বনি-মূর্ছনা জেগে ওঠে। অপূর্ব মর্মস্পর্শী সে সংগীত-ঝনঝন। এ সংগীত মনকে অভিভূত করে ফেলে। প্রতিটি ঘণ্টা শেষ হলেই ঘরের মধ্যকার বাদ্যযন্ত্রীরা হঠাৎ থেমে যায়। কান খাড়া করে সবাই বসে থাকে, বুক দুরুদুরু করে ওঠে। তাদের সংগীতের সুর—তাল একমুহুর্তে কেটে যায়। তারপর ঘড়ির সেই মধুর বাজনা শুরু হয়। অদ্ভুত, হৃদয়গ্রাহী, মারাত্মক সেইবাজনা। অতি চঞ্চল, অতি সাহসী লোকও শোনামাত্রই আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। যারা একটু বেশি বয়স্ক এবং শান্ত প্রকৃতির, তারা কপালের উপরটায় একবার হাত বুলিয়ে নেয়, কী যেন অনুভব করবার চেষ্টা করে। সে কি স্বপ্ন না ধ্যানমগ্ন অবস্থা! বাজনা থেমে যায়, তার প্রতিধ্বনিও থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই একটুখানি হেসে ওঠে। বাদকরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মৃদু হাসে। মনে মনে তারা প্রতিজ্ঞা করে আর কখনো এমনভাবে আতঙ্কিত হবে না। পরবর্তী বাজনাটা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে এই ধরনের মানসিক আবেগ সঞ্চার করতে পারবে না। সুদীর্ঘ ষাটটি মিনিট পার হয়ে যায়। আবার সেই বাজনা। বাদকদের আবার সেই হঠাৎ থেমে যাওয়া। সবারই মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ। সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা।

কিন্তু এই অস্বস্তিকর কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া মজলিশটিকে অত্যন্ত জাকজমক, আমোদপ্রমোদ এবং হৈ-হট্টগোল পূর্ণ বলা যায়। যুবরাজের রুচিবোধ অদ্ভুত বলতে হবে। রঙ ও তার প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে হয়। মামুলি প্রথামতো আসবাবপত্র সাজানোটাকে তিনি পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা খুবই সজীব ও বিশেষ রকমের আড়ম্বরপূর্ণ। তার রুচির মধ্যে একটা আদিম বন্যতার ছাপ পাওয়া যায়। এর ফলে তাকে কেউ কেউ পাগল ভাবে। কিন্তু তার পরিষদরা তাকে পাগল মনে করে না। তার কাছাকাছি থেকে তাকে দেখলে-শুনলে বিশ্বাস করতেই হবে। যে তিনি পাগল নন।

ঘরগুলোর আসবাবপত্রের, সাজসরঞ্জামের স্থান নির্দেশের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও সুচারু সব ব্যবস্থাই তিনি প্রায় করেছিলেন নিজে। এতে তাঁর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই আনন্দ-উৎসবের যা কিছু আড়ম্বর, যা কিছু সৌন্দর্য, এই মুখোশনাচের যে চমৎকার পরিকল্পনা, এ সবই তার রুচিসম্মত নির্দেশেই সম্ভব হয়েছিল। বলাবাহুল্য, অপরূপ সে দৃশ্য। চোখধাঁধানো চাকচিক্য, কল্পনার পাখনা-

মেলা প্রসারতা, সব মিলে অপূর্ব এক দৃশ্যপট। এ স্বপ্নালু পরিবেশের তুলনা হয় না। নানান জায়গায় প্রাচ্যসুলভ জটিল মিহি কারুকার্যখচিত জীবজন্তুর ছবি, অদ্ভুত অস্বাভাবিক তাদের হাত-পায়ের গড়ন আর ভঙ্গি। বিকারগ্রস্ত মনে যে ছবি আঁকা যায় তা স্বাভাবিক না হয়ে ভৌতিক বা অদ্ভুত-কিন্তুত আকারের হবে এটা জানা কথা। এইসব ছবিও যেন কোনো উন্মাদের হাতে আঁকা, কিস্তুতকিমাকার। সব তাতেই একটা উদ্ভট সামঞ্জস্য। কোনোটা দেখলে আঁতকে উঠতে হয় আবার কোনোটায় বিরক্তি আসে। মোট কথা, সাতটি ঘরের এই নানান ধরনের দৃশ্য মিলে এক আশ্চর্য স্বপ্নবেশ সৃষ্টি করেছিল। এক-একটি ঘরের এক-একরকম রঙিন আলো, বাদ্যযন্ত্রীদের সংগীতের মূর্ছিনা, যেন এক-একটি স্বপ্নের মতো তাদের নিঃশব্দ পদধ্বনি জাগিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে সেই বিরাট দেয়ালঘড়িটার রহস্যময় বাজনা। বাজনার আগমুহূর্তেই সব চুপচাপ, স্বপ্নও যেন স্তম্ভিত, শিউরে উঠে ভয়ে হিম হয়ে যায়। শুধু ঘড়িটার শব্দ, টিক টিক টিক। বাজনা থেমে যায়, তার প্রতিধ্বনিও ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যায়। সব একমুহূর্তের জন্যে থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাপা হাসির আওয়াজ। বাদ্যযন্ত্রের ঝনঝনি আবার বাতাসকে মুখর করে তোলে। স্বপ্নগুলো আবার যেন ভেসে বেড়াতে থাকে। জানালার রঙিন কাচের আলোতে নতুন করে যেন আবার তারা বেঁচে ওঠে, নেচে নেচে ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। এদিকে জীবনচাঞ্চল্যের এই স্বপ্নাচ্ছন্ন লঘু ক্ষিপ্রতা আর এই রঙ, এই আলো। ওদিকে পশ্চিমদিকের ঘরটা আবার জনশূন্য। আজকের মুখোশনাচের কোনো মুখোশধারীই সে ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। বিশেষ করে এ সময়টায় রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাতির আলো যেন আরো রক্তাক্ত, আরো বীভৎস হয়ে ভেতরের জানালার চৌকাঠে এসে পড়েছে।

কালো পরদায় ঢাকা। কালো, রাতের আঁধারের চেয়েও কালো, নিরেট সূচিভেদ্য অন্ধকার যেন একটা অশরীরীদের ছায়া-ছায়া উপস্থিতি যেন সে অন্ধকারকে আরো গভীর, আরো স্তম্ভিত করে রেখেছে। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। ঘরে ঢুকে কার্পেটের উপর পা রাখতেই মনে হয় শ্মশানে এসে পড়েছি। পাশের ঘরগুলোতে যে আনন্দহিল্লোল চলছে, তার কলকোলাহলকে ছাপিয়ে শুধু একটা শব্দ, চাপা একটা রহস্যময় শব্দই শুধু কানে, স্নায়ুতে এসে আঘাত করে। টিক টিক টিক।

অন্য ঘরগুলোতে জীবনচাঞ্চল্যের অভাব নেই। এই প্রমোদ-উন্মাদনা বয়েই চলে মাঝরাত পর্যন্ত। প্রায় রাত বারোটা। বাদ্যযন্ত্রের সুরঝঙ্কার থেমে যেতে চাচ্ছে। যন্ত্রীদের সুরের তাল মাঝে মাঝে কেটে যায়। সব চুপচাপ। বিস্ময়কর এক অস্বস্তি। ঢং-ঢং-ঢং, বারোটা বাজতে থাকে। আনন্দ উল্লসিত পরিষদরা স্তব্ধ হয়ে যায়। বিদ্রী এক অস্বস্তিতে ভরে ওঠে মন। বুকচাপা নিস্তব্ধতা। গভীর ধ্যানলীনতা, যেন মৃত্যুশীতল প্রতীক্ষা। ঘড়ির শেষ শব্দটার রেশ তখনো বাতাসে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়নি। এমন সময় কে? কে ওই অচেনা আগন্তুক? কে? কে? সবাই ব্যস্ত

হয়ে ওঠে। মুখোশধারী ওই নতুন আগন্তুকটি কে? কোথা থেকে এল? বাতাসে বাতাসে যেন তার আগমনবার্তা ছড়িয়ে যায়। চারদিকেই একটা চাপা গুঞ্জন। চাপা একটা ভৎসনা। স্পর্ধা বটে লোকটার। পরীক্ষণেই বিস্মিত হয় সবাই। কিন্তু এল কী করে। একটু পরেই আবার সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, আবার বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে।

বলাবাহুল্য আগন্তুককে কোনো সাধারণ লোক বলে বোধ হয় না। তাহলে তার আকার-প্রকৃতি দেখে কেউ-ই এতটা বিচলিত, এতটা আলোড়িত হত না। বাস্তবিক আজকের রাতের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যুবরাজের ঢালাও হুকুম ছিল যে, যেরকম খুশি মুখোশ বানিয়ে পরে থাকতে পারবে। হয়েছিলও তাই। সবাই অদ্ভুত, উদ্ভট সব নানা রকমের মুখোশ পরেছিল। কিন্তু উদ্ভট পরিকল্পনায় আগন্তুকের এ মুখোশ যেন আর সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যুবরাজের খেয়ালি বিচিত্র পরিকল্পনাও যেন এর কাছে কিছুই নয়। আবেগের এমনি গুণ যে নেহাত সাহসী, অসাবধানী লোককেও অনুভূতিশীল এবং ভিত্তি করে তুলতে পারে। জীবন-মৃত্যু যাদের কাছে সমান উপভোগের, সমান তাচ্ছিল্যের ব্যাপার; তাদের সামনেও মাঝে মাঝে এমন কোনো কিছু আসে যখন তারা তাকে পরিহাস, তাচ্ছিল্যের বা আনন্দের বলে মনে করতে পারে না।

সবাই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। গভীরভাবে ভাবতে লাগল। আগন্তুকের পোশাক এবং আকার-প্রকারে কোনোরকম বুদ্ধির পরিচয় বা কোনো রুচিবোধেরও যেন চিহ্ন নেই। সুদীর্ঘ কৃশ মূর্তি। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা। যেন কাফন পরা। মুখে আঁটা মুখোশটা দেখলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মড়ার শুকনো মুখের একটা আকৃতি। মুখোশটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরি। মুখোশের আড়ালে যে মুখটি আছে তাকে চিনে নেয়া সত্যিই শক্ত। তবু যুবরাজের সাস্পোপাঙ্গরা এই আগন্তুককে স্বীকার করে তাদেরই একজন বলে মেনে না নিলেও আপাতত সহ্য করে নিতে পারত। কিন্তু এই দুর্বৃত্ত উঁড়টির ছদ্মবেশের মধ্যে এমন একটা ভাবভঙ্গি ছিল যা শুধু লাল মড়কের কথাই সবাইকে বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আগন্তুকের কাপড়ে রক্ত, ছিটানো রক্তের দাগ। তার লাল মুখে মোটা ভুরুদুটোও বীভৎস গাঢ় লাল রঙে গভীরভাবে আঁকা।

ভৌতিক মূর্তিটি ধীর-গভীর ছন্দে নাচিয়েদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মূর্তির দিকে নজর পড়তেই যুবরাজ প্রথমটা একটা অজানা আতঙ্কে চমকে উঠলেন। পরীক্ষণেই বিরক্তিতে, রাগে তিনি আগুন হয়ে গেলেন।

কার এই স্পর্ধা? উত্তেজনায় তার গলার স্বর ভেঙে এল। পাশেই পারিষদরা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে এবার তাকিয়ে তিনি আবার চিৎকার করে উঠলেন, এভাবে আমাদের উপহাস করার কার এই দুঃসাহস? ধরো ওটাকে, খুলে ফেল ওর মুখোশ। কাল সকালেই ওকে ফাঁসি দেয়া হবে। ধরে নিয়ে এসে শয়তানটাকে।

যুবরাজ তখন পূর্বদিকের নীল কামরাটায় দাঁড়িয়ে। তার ক্রুদ্ধ চিৎকারের থমথমে শব্দ সাতটি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। যুবরাজ অত্যন্ত

একগুঁয়ে আর দুরন্ত সাহসী। তার ক্রোধে যন্ত্রীরা ভয়ে চুপ হয়ে গেল। চারদিকেই গভীর নিস্তব্ধতা।

নীল ঘরের মধ্যে যুবরাজ দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাশেই পাংশুমুখে পারিষদরা। প্রথমটা তার হুংকার মাত্রই কেউ কেউ একটু এগিয়ে গেল আগন্তকের দিকে। আগন্তকও বেশি দূরে ছিল না। যুবরাজের গুরুগম্ভীর ঘোষণা শেষ হতেই আগন্তককে এবার তারই দিকে রাজকীয় ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ধীর পদক্ষেপ তার। কিন্তু কী এক অজানা ভয়ে দলের কারুরই সাহস হল না যে হাত বাড়িয়ে মুখোশধারীকে ধরে ফেলে। সবাই আতঙ্কিত। আগন্তক কোনো বাধা না পেয়ে যুবরাজের আরো কাছে সরে এল। এক গজেরও কম দূরত্ব এখন। পারিষদরা কী এক অব্যক্ত ভয়ে মোহাম্বলের মতো দেয়ালের দিকে সরে গেল। আগন্তকও বাধা না পেয়ে এবার নিজের পথ করে নিল সেই গভীর মাপা পদক্ষেপে। সেই একই ধীরমন্ত্র দৃঢ় গতিভঙ্গি। প্রথমে গেল নীল থেকে ধূসর বর্ণের ঘরে। সে ঘর থেকে সবুজ ঘরে। সবুজ ঘর পেরিয়ে কমলারঙের ঘরে। এ ঘর থেকে সাদা ঘর হয়ে বেগুনি রঙের ঘরে। যুবরাজ তার সাময়িক দুর্বলতার কথা মনে করে মনে মনে লজ্জিত হলেন। রাগে পাগলের মতো হয়ে তিনি পাশাপাশি ছটা ঘরের মধ্যে দিয়ে মুখোশধারীকে তাড়া করে নিয়ে গেলেন। পারিষদরা সবাই অপার্থিব এই দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে আতঙ্কে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল যে, প্রভু যুবরাজকে অনুসরণ করার শক্তিও যেন শেষ হয়ে গেল তাদের। ক্রোধে উন্মাদনায় যুবরাজ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য প্রায়। হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে তিনি হুঙ্কার দিতে দিতে তাড়া করে চললেন। শেষে প্রায় ধরে ফেলবার উপক্রম। মুখোশধারী আর মাত্র দুহাত দূরে। মূর্তিটি লাল ঘরে ঢুকে পড়ল। যুবরাজ ঢুকে পড়লেন সেই ঘরে। হঠাৎ মুখোশধারী ঘুরে দাঁড়াল। যুবরাজের মুখোমুখি। মাঝে একটিমাত্র মুহূর্ত। তার পরেই বিকট এক আর্তনাদ। পরীক্ষণেই যুবরাজের হাতের ঝকঝকে তলোয়ার মেঝেয় পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজ প্রসপ্যারোর মৃতদেহও লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে পরিষদরা সেই ঘরে এসে জড়ো হল। মুখোশধারীকে তারা ধরে ফেলল। আগন্তক বিরাট ঘড়িটার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মরিয়া হয়ে সবাই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখোশটা টেনে ছিড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু এ কী? শুকনো মড়ার মুখের মতো মুখোশটা খুলে এল। কিন্তু কোথায়? এর মধ্যে মুখ কোথায়? মড়ার কুকড়ে যাওয়া চামড়ার মতো কাফনের কাপড়টা ছিড়ে এল, কিন্তু কিসের উপর জড়ানো ছিল এ কাপড়? কিছুই নেই, কেউ নেই! নারকীয় বীভৎস এই দৃশ্য আর কেউ সহ্য করতে পারল না। একে একে সবাই রক্তাক্ত মুখে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ঘরগুলো ভরে উঠল আড়ষ্ট বীভৎস মৃতদেহে।

সুরক্ষিত দুর্গলাল মড়ককে রোধ করতে পারল না। এই নিরাপদ জায়গায় সে এসেছিল চোরের মতো চুপি চুপি। রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে। এখন সেখানে

প্রাণীর সাড়া পাওয়া যায় না। লাল মড়কের হিংসা-কুটিল স্পর্শে সব শেষ, সব নিস্তন্ধ। বিরাট ঘরটাও এবার নীরব নিথর হয়ে গেছে। রক্তমুখী মড়কের এই ধ্বংসের রাজ্যে কোনো শব্দ, কোনো জীবনচাঞ্চল্য আর নেই। শুধু নিস্তন্ধতা। চৌকির উপর উজ্জ্বল বাতিগুলো এবার একে একে নিভে গেল। স্তন্ধ রাত, মৃত্যুশীতল কালো রাত। ধ্বংসের রাত। লাল মড়কের অনন্ত অসীম রাজ্য।

আশার বংশের পতন

শরৎকালের আকাশে শুধু দু-একটা ক্লান্ত মেঘ, দিনগুলো শ্রান্ত ও বিষন্ন। ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছি। এই নির্জন পথে। নিস্তর প্রান্তরে ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। আলোছায়ার আস্তরণ ভেদ করে দূর থেকে চোখে পড়ল বিষাদভরা আশার পরিবারের বিরাট বাড়িটা। “হাউস অব আশার” নামেই এর পরিচয়। বাড়িটা ঠিক কেমন তখনো জানি না, তবুও টের পেলাম একটা অজানা বিষন্নতা আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। দুঃসহ ভয়াবহ অথবা ভারি নির্জন কিছু একটা দেখলে মানুষের মনে যে বিচিত্র দোলা এসে লাগে, ঠিক তেমনি একটা অনুভূতি আমাকে বিহ্বল করে ফেলেছে।

চোখের সামনে সেই জনশূন্য বাড়িটা। আশেপাশে ছবির মতো গাছ আর বিস্তীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু দেয়াল আর নির্জন জানালাগুলো তাকিয়ে আছে লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে। একপাশে ঘাস আর শ্যাওলার পুরু আস্তর আর অন্যদিকে বহুকালের মরে যাওয়া শুকনো গাছের বিবর্ণ গুড়ি। আমি একদৃষ্টি তাকিয়ে রইলাম। মনে এখন আমার এমন একটা সুর, যার তুলনা এই মাটির পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ যেন আফিমের নীল নেশার ঘোর কেটে যাবার পর আবার দৈনন্দিন তিক্ত দিনগুলোতে গড়িয়ে পড়বার ভয়াবহ মুহূর্ত। সেই অমোঘ নেশার পরদা সরে যাবার দুঃসহ ক্ষণ আমাকে পেয়ে বসেছে। একটা তুহিন স্পর্শ; তলিয়ে যাবার, হারিয়ে যাবার বুকভঙা অনুভূতি বুঝি এ।

এই যে আমার একটানা নির্জন ভাবনা, একে হাজার চেষ্টা করেও এখন বোধহয় আর ফেরাতে পারব না। ফেরাতে পারব না কোনো শুভ্র শান্ত, স্থির হৃদয়ের বিশালতার দিকে। এ কিসের অনুভূতি? হাউস অব আশার-এর চিন্তা আমাকে বিহ্বল করে তুলল কেন? এ এক দুজ্জ্বল রহস্য বুঝি—বা, যা আমি কোনোদিন জানতে পারব না। শেষ অবধি মনে হল এমন অনেক কিছু এই পৃথিবীতে আছে যাদের অদ্ভুত প্রভাব আমাদের মনকে এমনি করে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার সমাধান করতে হলে আমাদের নেবে যেতে হয় হৃদয়ের অনেক গভীরে। সেখান থেকে উদ্ধার করতে হয় সব সূত্র। হয়তো একটু অন্য কোণ থেকে, অন্য দিক থেকে ছবিটাকে যদি আবার দেখি, তাহলে আমার বিশ্ববাস, এই অনুভূতি আমাকে হানা দেবে না। তার রহস্য যেন অনেকটা কমে আসবে, এমনকি নিঃশেষও হয়ে যেতে পারে। এই কথা ভেবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলাম। ঘোড়াটাকে বাঁধলাম সামনের ছোট্ট একটা দিঘির পাড়ে। পাড়ভাঙা দিঘির ঘোর কালো পানিতে ভাসছে পুরু জলজ আগাছা। দিঘির বুকে প্রতিফলিত বাড়িটার দিকে চোখ ফেরালাম। উল্টো হয়ে ছায়া পড়েছে বাড়িটার, ছোট জানালাগুলোর আর সেই বিবর্ণ গাছের গুঁড়িটার। কিন্তু এ কী? আগের চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্ক আর শঙ্কায় আমার সারাশরীর এভাবে কেঁপে উঠছে কেন?

তবুও ঠিক করলাম। এই বিষন্নতার রাজ্যে, এই প্রাসাদেই আমি কয়েক সপ্তাহ কাটাব। এর বর্তমান মালিক রোডেরিক আশার আমার ছোটবেলার বন্ধু। তার সাথে শেষ দেখা হওয়ার পর অনেক দিন কেটে গেছে। কিছুদিন আগে তার চিঠিও পেয়েছিলাম একটা। এই বাড়ি থেকেই লিখেছিল সে চিঠিটা। তাতে শুধু বারবার উত্তর দেবার অনুরোধই ছিল। আর কিছু না। হাতের লেখা দেখে বুঝেছি লেখকের স্নায়বিক উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। চিঠিটাতেও লিখেছে খুব একটা সাংঘাতিক অসুখে ভুগছে ও। একটা চরম মানসিক অশান্তি তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। ও জানিয়েছে আমাকে একবার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ওর। তার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে যেন তাকে একবার অতি অবশ্য দেখতে যাই। হয়তো আমার সাহচর্যে ওর রোগগ্রস্ত মন অনেকটা সুস্থ হতে পারে, কিছুটা উপশম হতে পারে যন্ত্রণা। এই ভরসায় ও যেতে লিখেছে। যতটুকু সে লিখেছে তার চেয়ে অনেক বেশি আকৃতির ছাপ রয়েছে। ওর চিঠিতে। সমস্ত মন যেন ওর ফুটে উঠেছে এতে। তাই আমি আর দ্বিধা করতে পারিনি। তার একান্ত আবেদনভরা ডাক আমি উপেক্ষা না করে চলে এসেছি। এখানে।

যদিও ছেলেবেলায় দুজনে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু খুব বেশিকিছু আমি জানিনে ওর সম্বন্ধে। ওর গাঙ্গীর্ঘ্য ছিল ওর অভ্যেসেরই মতো। মাঝে মাঝে সেটা আমার একটু বাড়াবাড়ি বলেও মনে হত। আমি জানতাম স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের বংশের এই প্রাচীন রক্তে এক বিশেষ ধরনের মেজাজ গড়ে উঠেছে, যা বিকশিত হয়েছে শিল্পের বিভিন্ন শাখায়; যা পরে প্রকাশিত হয়েছে। উদার অথচ নির্মোহ বদ্যান্যতায়, সংগীত আর বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। আরো একটা বড় কথা আমার জানা ছিল যে, আশার বংশের যে সম্মানিত রক্ত, তাকে কোনোদিন পরিবারের ভেতর থেকে বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ সাদা কথায় তারা বংশের মূলধারাটা সবসময়েই রক্ষা করে এসেছে, তাতে কোনো মিশ্রণ ঘটতে দেয়নি। ঠিক এই কারণেই আমার মনে হয়েছে, তাদের চরিত্রের ধারার এই—যে অনুবর্তন, তাদের এই যে অভিজাত মেজাজ তা আশেপাশের মানুষকে এতখানি আচ্ছন্ন করতে পেরেছে। পাশাপাশি অনুরূপ সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশের অনুপস্থিতির কারণে বাপ ও সন্তান উভয়কেই এবং এই প্রাসাদ আর তাদের পরিবার দুটোকেই এখন “হাউস অব আশার” বলেই অভিহিত করা হয়।

সেই ছেলেমানুষ ধারণার বশবর্তী হয়ে দিঘিতে যে প্রাসাদের ছায়া দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলাম তার ফল হয়েছিল উল্টো। আরো আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। বিশ্বাস আর অবিশ্ববাসের বাঁধ আমার ভেঙে গিয়েছিল। আমার মন হাজারো কুসংস্কারে ভরে উঠেছিল। একে আমি কুসংস্কারই বলব। অনেকদিন ধরে লক্ষ করেছি, ভয় থেকে যে অনুভূতির জন্ম, সেক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়। হয়তো ঠিক এ কারণেই আমি যখন দিঘির পানির ওপর থেকে প্রাসাদের দিকে চোখ তুলে তাকালাম তখন অদ্ভুত এক রহস্যময়তা আমাকে ঘিরে ধরল। হাস্যকর আমার সে চিন্তা। শুধু কতখানি অভিভূত যে আমি হয়েছিলাম সেটুকু জানবার

জন্যই কাটা বলছি। দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হতে লাগল যে এই প্রাসাদ ও তার আশেপাশে এক নাম-না-জানা অদ্ভুত পরিবেশ বিরাজ করছে। তার চারপাশে যে হাওয়া বইছে তার সাথে যেন পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। সে যেন আলাদা হয়ে পাকে পাকে উঠে গেছে। মরা গাছের গুড়ির ভেতর থেকে, বিবর্ণ দেয়াল আর কালো দিঘির বুক থেকে। স্তরে স্তরে উঠে গেছে সেই অস্বচ্ছ রহস্যময় হাওয়া, মিলিয়ে গেছে স্নান হয়ে—অদ্ভুত একটা স্পর্শ তার।

সেই স্বপ্নাভিভূত আচ্ছন্ন অবস্থাকে জোর করে দূরে সরিয়ে আমি প্রাসাদটিকে ভালো করে দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম। প্রথমেই চোখে পড়ে এর প্রাচীনত্ব। কালের ছাপ তার গায়ে সুস্পষ্ট। মিহি শ্যাওলায় বাইরের দিকটা সম্পূর্ণ ছেয়ে গেছে। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। বাড়িটার কোনো অংশই ভেঙে পড়েনি। সবটাই এখনো অটুট। তবে ক্ষয়িষ্ণু পাথরগুলো আর বাড়িটার অক্ষত কাঠামোর মধ্যে অদ্ভুত রকমের একটা সামঞ্জস্যহীনতা চোখে পড়ে। এ যেন ঠিক পুরনো খোদাই করা কাঠের মতো। পুরনো, অনেক পুরনো। কেউ কোনোকালে হাত দেয়নি যেন, এতদিন এক কোণে শুধু একা পড়ে ছিল। বাইরের জল-বাতাসও স্পর্শ করেনি। নির্জনতার এই ছাপ বুকে করেও বাড়িটা অটুট কাঠমো নিয়েই দাঁড়িয়ে। তবে, কেউ যদি খুব বেশি খুঁটিয়ে দেখে তাহলে দেখতে পাবে, সামনের দিকে কার্নিশ থেকে শুরু করে একটা ফাটল ঐকেবেঁকে নেমে এসে ক্রমে হারিয়ে গেছে নিচে দিঘির পানিতে।

সামনের ছোট পথটুকু ঘোড়ার পিঠে করে এগিয়ে গেলাম। একজন চাকর এসে আমার হাত থেকে লাগামটা তুলে নিল। পা বাড়ালাম সূক্ষ্ম কারুকাজ করা মখমলে ঢাকা বিশাল হলঘরের ভেতরে। নিঃশব্দ পায়ের একজন আরদালি আমাকে আগে আগে পথ দেখিয়ে, অনেক অন্ধকার আর ঘোরানো পথ পেরিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল তার মনিবের পড়বার ঘরটিতে। তখনো কেবলই সেই আগের ভাবনাগুলো এসে আমার মনের কোণে ভিড় জমাচ্ছে। চারদিকে এই যে বিশাল ছাদ, কারুকাজ করা দেয়াল, ঝকঝকে কালো আবলুশের মতো মেঝে আর বিচিত্র ঝাড়বাতি, এ সবই যেন আমার সেই ছোটবেলা থেকে কত চেনা। তবু এই মুহূর্তে মনে হল, আমি যেন ঠিক চিনি না এদের। ভাবলাম, সত্যি এই সাধারণ জিনিসগুলোর কী অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষের হৃদয়কে বিহবল করে দেবার। সিঁড়ির এক জায়গায়, প্রাসাদের ডাক্তারের সাথে দেখা হল। মুখে তার একধরনের চতুরতা আর বিহবলতার ছাপ। তার সম্ভাষণের স্বরে লক্ষ করলাম একটা শঙ্কার ছায়া। একসময় হঠাৎ করেই তিনি চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরদালি একটা দরজা খুলে আমাকে ডাকিল। ঘরের ভেতরে তার মনিব।

এ ঘরটা অনেক বড় আর বেশ উঁচু। জানালাগুলোও উঁচু, কিন্তু চওড়ায় কম। সেগুলোর শীর্ষ কালে ওক কাঠের মেঝে থেকে এত উঁচুতে যে, মনে হয় ওখানে পৌঁছানো বুঝি—বা অসম্ভব। বাইরের হালকা আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে ভেতরে। তাতে ঘরের আসবাবপত্রগুলো বেশ স্পষ্ট আর ঝকঝকে হয়ে চোখে

লাগছে। ঘরের সুদূর কোণে কিংবা ছাদের দিকে থোকা থোকা বিষন্ন অন্ধকার। ভালো করে চোখ মেলে সেটা ঠাহর করতে হয়। গাঢ় রঙের পরদা ঝুলছিল দেয়ালে। ঘরে প্রচুর আসবাবপত্র, ভাঙা ভাঙা, পুরনো আমলের। এখানে— সেখানে পড়ে রয়েছে রাশ রোশ বই আর বাজনার সরঞ্জাম। তবু যেন প্রাণ নেই ঘরটিতে। যেন একটা বিষন্ন বাতাসের গুমোট পরিবেশের মধ্যে আমি এখন দাঁড়িয়ে। একটা অনির্বচনীয় বেদনা-ভারাক্রান্ত পরিবেশ যেন আরো গভীর করে তুলেছে সমগ্র ঘরটাকে।

সোফার উপর লম্বা হয়ে শুয়েছিল আশার। আমি ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে গাঢ় অভ্যর্থনায় আমাকে অভিভূত করে তুলল। কিন্তু তার চেহারার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গাঢ় বিশ্বাস হল যে, এ তার অভিনয় নয়। দুজনে বসলাম নীরবে। তার দিকে শুধু তাকিয়ে রইলাম, কিছুটা করুণা, কিছুটা শঙ্কার দৃষ্টিতে। সত্যি রোডেরিক আশারের মতো এত অল্প সময়ে এত বেশি পরিবর্তন আর কারু হয়েছে বলে আমি দেখিনি। অনেক কষ্টে আমাকে বিশ্বাস করতে হল যে, আমার সামনে যে বিবর্ণ ফ্যাকাসে মুখখানি, একে আমি ছোটবেলায় চিনতাম। ওর মুখের আদল চিরকালই বিশেষত্বপূর্ণ ছিল। সারাটা শরীর মড়ার মতো ফ্যাকাসে, চোখজোড়া আয়ত আর অতুলনীয় উজ্জ্বল। পাণ্ডুর ঠোঁটজোড়া একটু পাতলা, কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর। গ্রিক মডেলের মতো খাড়া নাক, কিন্তু সে হিসেবে ওর নাকের ছিদ্র ছিল একটু বড়। চিবুকের গঠন সুন্দর। সকলের চেয়ে ও যেন একটু আলাদা রকমের। দেখলেই মনে হয় ভেতরে ভেতরে ও যেন মরে আছে। চুলগুলো ওর ভারি নরম। কপালটা প্রশস্ত। সব মিলিয়ে ওর চেহারাটা মনে রাখবার মতো। আজ তার চেহারার এই বিশেষত্বটুকু এতটা প্রখর আর তার স্বাভাবিক চরিত্র এতটা স্পষ্ট হয়ে মুখে ফুটে উঠেছে যে, প্রথমটা আমার সন্দেহ হয়েছিল, এ কার সাথে আমি কথা বলছি! ওর গায়ের বিবর্ণ রঙ, চোখের রহস্যময় জ্যোতি আমাকে বিহবল করে ফেলল। আমার ভেতরে-বাইরে দোল দিতে লাগল অজানা এক আতঙ্ক। মাথায় এলেমেলো একরাশ চুল ইচ্ছেমতো বেড়ে উঠেছে। ওর। সে রুক্ষতা কেমন যেন ভয়াবহ।

ওর ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করল। কখনো ও উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে, কখনো আবার গভীর হয়ে পড়েছে। মনে হল, অনেক কিছু বাধাকে জয় করবার দুরাশায় ক্লান্ত হয়ে ও যেন আজ ভেঙে পড়েছে। গলার স্বর কেমন যেন বিচিত্র আর অসম। কখনো স্থির প্রশান্ত গলায় কথা বলছে। কখনো আবার স্বর এত ভারী হয়ে আসছে যে, মনে হয় কোনো মাতাল বা আফিমখোর নেশার চরম মুহুর্তে কথা বলছে।

এমনিভাবেই ও বলে গেল, কেন ও আমায় আসতে লিখেছে। জানাল আমাকে দেখবার ওর গভীর গভীর ব্যাকুলতার কথা, আমার কাছ থেকে কী সাত্বনা ও পেতে চায় সেসব বিষয়। বেশ কিছুক্ষণ পর এবার ও ওর অসুখের কথা পাড়ল। ও জানাল অসুখটা ওদের বংশগত এক অভিশাপ, যার সমাধানের চেষ্টা

করে ও নিরাশ হয়েছে। এই নিরাশার পরিণামে স্নায়বিক দুর্বলতা। তবে ও বিশ্বাস করে এটা কেটে যাবেই। এই দুর্বলতার ধারণাটিও কিন্তু অদ্ভুত রকমের। অস্বাভাবিক এক অনুভূতি প্রকাশ পেল ওর প্রতিটি কথায়। ও বলল, সবচেয়ে বিশ্বাস খাবারই ওর ভালো লাগে। বিশেষ ধরনের কাপড় ছাড়া ও আর কিছুই গায়ে রাখতে পারে না। সামান্য একটু আলোও ওর অসহ্য মনে হয়। ফুলের গন্ধও ওর কাছে আজ পীড়াদায়ক। সংগীত যন্ত্রের কয়েকটি বিচিত্র স্বর ভিন্ন আর সবরকমের স্বরই ওর মনে জাগায় আতঙ্ক।

লক্ষ করলাম, অদ্ভুত অস্বাভাবিক এক আতঙ্ক ওকে পেয়ে বসেছে। বলল, “নিতান্ত নির্বোধের মতোই আমাকে ধ্বংস হতে হবে। এভাবেই আমার হবে মৃত্যু, আর কিছুতে নয়। ভবিষ্যৎকে আমার ভয় করে। না, ঠিক ভবিষ্যৎকে নয়, তার পরিণতিকে। আমার সংশয়-বিস্মৃদ্ধ মনে সামান্যতম ঝড় বইয়ে দিতে পারে, এমন কিছু— একটু চিন্তা করতেই আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি। বিপদকে আমার ভয় করে না বটে। তবে তার চরম অবস্থা— যেখানে বিভীষিকার জন্ম, সেখানটিতেই আমি অসহায় বোধ করি। বুঝতে পারছি এই দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় এমন একদিন আসবে যখন এক অজানা বিভীষিকার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে আমার প্রাণ ও বুদ্ধি দুই-ই শেষ হয়ে যাবে।”

এমনিতর টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কথার ভেতর দিয়ে তার মনের আরো একটা দিক প্রকাশ হয়ে পড়ল। নতুন যে বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছে সেখানকার কিছু কুসংস্কার ওর ওপর সম্প্রতি ভর করেছে। এই কুসংস্কারটা যে কী ও সেটা স্পষ্ট করে বলল না। এই কুসংস্কারও ওর এই পারিবারিক বাড়িটার কুসংস্কারেরই মতো। শুধু একটু অদলবদল ছাড়া। আর তা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আশেপাশের এই ধূসর দেয়াল, গম্বুজ আর কালো দিঘি, সবকিছু ওকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

শেষ অবধি একটু ইতস্তত করেই ও বলল, “এর পেছনে অবশ্য একটা স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো যেতে পারে। আর তা হচ্ছে আমার সবচেয়ে স্নেহের পাত্রী এবং সাথী, আমার একমাত্র জীবিত আত্মীয়া, আমার সহোদরা বোনের দীর্ঘদিনের দুঃসহ রোগযন্ত্রণা।” অদ্ভুত এক তিজ্ঞতার সাথে (ওর এই তিজ্ঞতার অভিব্যক্তিটুকু চিরকাল আমার মনে থাকবে) ও বলে চলল, “সে যদি চলে যায় তাহলে একমাত্র আমিই এই। “হাউস অব আশার”-এর শেষ উত্তরাধিকারী হিসেবে বেঁচে থাকব।” ঠিক এই সময়ে ওর বোন লেডি মেডেলিন (ওই নামেই তার পরিচয়) আমাদের ঘরটি পেরিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। তিনি আমাকে দেখতে পাননি। তাকে দেখামাত্রই আমার মনে এক বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার হল। কিন্তু কারণ কী তা আমি বুঝতে পারলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মেডেলিনের দিকে নজর পড়তেই আমার সমস্ত চেতনা যেন স্তব্ধ হয়ে এল। তিনি দরজা বন্ধ করতেই স্বাভাবিকভাবে আমি মুখ ফেরালাম তাঁর ভাইয়ের দিকে, একটু ঔৎসুক্য নিয়েই। আশার তখন দুহাতে তার মুখ ঢেকে

ফেলেছে। হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক রকমের ফ্যাকাসে। দেখলাম, ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু।

লেডি মেডেলিনের ব্যাধিটা প্রথমে তাঁর ডাক্তারের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তিনি কিছুই ধরতে পারেননি। রোগলক্ষণের মধ্যে শুধু ধরতে পেরেছিলেন যে, রোগিণীর একধরনের স্থির বৈরাগ্য আছে। তাঁর শরীর ক্ষয় হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। এ ছাড়া মৃদু মূর্ছার লক্ষণও আছে রোগিণীর। তবুও এতদিন তিনি অবহেলা করে এসেছিলেন সে ব্যাধিকে। কিন্তু আজ তার অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে, তিনি শয্যা নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমি সবচেয়ে হতচকিত হয়ে গেলাম যখন রাত্রে তার ভাই আমাকে উদ্বেগ-অস্থির গলায় এসে জানোল, “সন্ধেয় আমি যে তাকে দেখেছি সেই-ই হয়তো তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।”

আমি বা আশার কেউই এর পর আর তার কথা আলোচনা করিনি। পরের দিনগুলোয় প্রায় সারাটি সময়ে বন্ধুর বিষন্নতাকে যথাসাধ্য দূরে সরিয়ে রাখতেই ব্যস্ত থাকতাম। দুজন একসাথে বই পড়তাম, আর ছবি আঁকতাম। কখনো-বা আমি চুপ করে শুনতাম তার আবৃত্তি। এমনি করে আমাদের দুজনের মধ্যে নতুন করে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে লাগল। অথচ এভাবে যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই বুঝতে পারছিলাম কত বৃথা আমার এই আনন্দদানের চেষ্টা। হৃদয় যেন তার এক অন্ধকারের উৎস। সেই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সমস্ত কিছুতে, সমস্ত চিন্তায়। আমি কী করে তা দূর করব?

কতদিন নীরবে আমি আর হাউস অব আশারের মালিক মুখোমুখি বসে কাটিয়েছি। তবু ঠিক বোঝাতে পারব না, কী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় কেটেছে। তার সেই আবৃত্তি আমি কোনোদিন ভুলব না। তার একটা সুরও আমার মনে থাকবে চিরদিন। সেটা হচ্ছে ফল ওয়েবারের শেষ ওয়ালৎজের বিকৃত সুরটি। আশারের আঁকা ছবিগুলো ছিল যেন তার মনেরই প্রতিরূপ। প্রতিটি আঁচড়ে একধরনের শূন্যতায় ভরে যেত ক্যানভাস। আমার সেদিনের সেসব অনুভূতি বোঝাতে পারব না। আজ। তার রেখার সারল্য, তার ডিজাইনের নগ্নতা মুহূর্তেই মনকে আচ্ছন্ন করে দিত। আমি বলব, যদি কেউ ভাবকে ছবির রূপ দিতে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে সে রোডেরিক আশার ছাড়া আর কেউ না।

কথায় এর কিছুটা বর্ণনা হয়তো দেয়া যেতে পারে। এই রহস্যময় ভাবধারাটা অনেকটাই ব্যক্তিগত। একটা ছোট্ট ছবি। এতে সে ঐকেছিল অনেক লম্বা আর আয়ত খিলানকরা ছাদ অথবা সুড়ঙ্গপথের নিচু মসৃণ দেয়াল। দেয়ালটা পুরোপুরি সাদা। কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই। সমান এবং সমান্তরাল চলে গেছে দেয়ালটা। ছবিটার আঁকবার ধরনে স্পষ্ট বোঝা যায় জায়গাটা মাটির অনেকখানি নিচে। সারাটা ছবির ভেতরে কোথাও বাইরে যাবার কোনো পথ আঁকা হয়নি। কোথাও কোনো মশাল বা বাতির চিহ্ন নেই। তবুও যেন কোথা থেকে পুঞ্জীভূত আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে সারাটা সুড়ঙ্গে। আর সেই বিচিত্র আলোয় এর রূপ হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। আর অস্বাভাবিক রকমে উজ্জ্বল।

একটু আগেই ওর মনের একধরনের অবস্থার কথা বলেছি। সমস্ত সংগীত ওর কাছে অসহ্য ঠেকে আর এ অসহ্যের ব্যতিক্রম শুধু দু-একটা তারযন্ত্রের বিশেষ একধরনের সুরধ্বনির ক্ষেত্রে। সেটাই শুধু ভালো লাগে ওর। আর এজন্যেই ও বাজাত গিটার। গিটারের সুরমূর্ছনায় ফুটে উঠত ওর চরিত্রের স্বরূপ। এ ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত ওর আবৃত্তিতে। আবেগের চরম মুহূর্তে তা উচ্চারিত হত। অদ্ভুত স্বর—লয়ে। ওর একটা কথা এখনো আমার মনে আছে। কথাটার ধোঁয়াটে অর্থের পেছনে যেন গোটা আশার পরিবারের ছবি আমি দেখতে পেয়েছিলাম। কোথাও যেন একটা বিরাট সাদৃশ্য ছিল ওর সঙ্গে সেই আবৃত্তির। এই প্রথম আমি অনুভব করলাম, আশার জানে সে কী ভীষণ চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সমগ্র প্রাসাদ, তার বিস্তারিত স্তরুতা, তার ভয়াবহ বিশালতা, এ সবই আশারের মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার একটা সুস্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছিল। সে ডুবে থাকত বইয়ের ভেতর। বইগুলোর সবই মানবজীবনের রহস্যময় আর বিচিত্র দিক নিয়ে লেখা। অতীতের অনেক প্রাচীন রোমাঞ্চকর বই ছিল তার প্রিয়। সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার একখণ্ড “চার্চ-ম্যানুয়াল”। বইটা খুবই দুর্লভ।

আমি যখন এইসব বইয়ের কথা ভাবছি। আর চিন্তা করছি মনের বিকার ঘটাতে তাদের প্রভাব কতখানি কার্যকর, এক সন্ধ্যায় ঠিক সেই মুহূর্তে ও ছুটে এসে আমাকে জানাল, লেডি মেডেলিন আর বেঁচে নেই। আরো বলল, মেডেলিনের মৃতদেহটাকে কবর দেবার আগে পনেরো দিনের জন্য প্রাসাদের একটা নিভৃত কক্ষে সে সংরক্ষিত করে রেখে দিতে চায়। রোগিণীর অস্বাভাবিক ব্যাধি-লক্ষণ এবং ডাক্তারের অনুসন্ধিৎসার জন্যেই ও এ-কাজটা করতে চায়। আর তা ছাড়া ওদের পরিবারিক গোরস্থান অনেকটা দূরে বলেও ও এটা ভাবছে। আমি যেদিন প্রথম এ বাড়িতে আসি, সেদিনকার সেই ডাক্তারের হতভম্বর চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। তাই আশারের পক্ষে এই সাবধানতা বিশেষ অস্বাভাবিক মনে হল না। আমিও এ বিষয়ে কোনো আপত্তি তুললাম না।

আশারের অনুরোধে লেডি মেডেলিনকে অস্থায়ীভাবে কবর দেয়ার ব্যাপারে আমি ওকে সাহায্য করলাম। কফিনের মধ্যে রেখে আমরা দুজনেই ওঁকে বয়ে নিয়ে গেলাম। যে গোপন কক্ষে আমরা মৃতদেহটি রাখলাম স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম অনেকদিন সেটা খোলা হয়নি। তার ভেতরকার সমস্ত আবহাওয়াটা চাপা আর রুদ্ধ। আমাদের মশালও তার সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করতে পারল না। চোখের সামনে বিশেষ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঘরটা ছোট আর স্যাতসেঁতে। কোনোখানে আলো আসবার এতটুকু পথ নেই। আমার যে ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল তারই ঠিক নিচে এই কক্ষটি। হয়তো সুদূর অতীতে এটাকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হত। এবং পরে সম্ভবত এখানে রাখা হত বারুদ বা ওই জাতীয় বিস্ফোরক কিছু। যে লম্বা সরু পথ দিয়ে আমরা ঢুকেছি তার সবটাই বেশ সুচারুভাবে তামা দিয়ে মোড়ানো। ভারি লোহার দরজাটাও

একইভাবে সুরক্ষিত। দরজাটা এত ভারি যে ঢুকবার সময়ে ঘরঘর আওয়াজ করে সেটা কবজার উপরে সরে গেল।

এই ভয়ঙ্কর কক্ষের একটা তাকের উপর কফিনটা ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম। তারপর তুলে ধরলাম কফিনের ডালাটা। লেডি মেডেলিনের মৃত মুখ আমার চোখের সামনে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম ভাই আর বোনের কী অদ্ভুত সাদৃশ্য। হয়তো আমার মনোভাব টের পেয়েছিল আশার। বিড়বিড় করে জানাল ওরা দুজন যমজ ভাই-বোন। তাই তাদের একের প্রতি অন্যের এত স্নেহ, এত মায়া আর ভালোবাসা। বেশিক্ষণ আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। যে ব্যাধি তাঁকে অকালে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে তা যেন এখনো ভারি হয়ে ওঁর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মুখে আর বুকের ওপর একধরনের রহস্যময় আভা। ঠোঁটদুটিতে এক অজানা রহস্যময় হাসি। মৃতের মুখে এ ধরনের হাসি অসহ্য। কফিনের ডালটা আস্তে আস্তে নামিয়ে লোহার দরজা বন্ধ করে ফিরে এলাম। খুব কষ্টে উঠে এলাম অন্ধকূপ থেকে কিছুটা মান-আলোকিত উপরের ঘরে।

শোকাভিভূত কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর বন্ধুর মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থার কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। সে যেন আর সেই আগের মানুষটি নেই। সমস্ত কাজ, সবকিছু যেন সে একেবারে ভুলে গেছে। শুধু এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে অস্থির অসম পায়ের উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পায়চারি করাই যেন তার এখনকার একমাত্র ব্রত। ভয়াবহ একধরনের বিষন্নতা এসে ভর করল ওর চোখেমুখে। চোখের সে উজ্জ্বল দীপ্তি এখন আর নেই। গলার সেই ভারি স্বরের পরিবর্তে এখন স্বর তার ভীতিকম্পিত। কখনো কখনো মনে হত যেন ওর বিক্ষুব্ধ মন যুদ্ধ করছে এক অজানা রহস্যের সাথে। ও যেন চাইছে। ওকে প্রকাশ্যে দিবালোকে তুলে ধরতে। কিন্তু অধিকাংশ সময় ওকে উন্মাদ বলেই মনে হত। শূন্যদৃষ্টিতে ঘন্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকত একদিকে নির্নিমেষে— যেন কোনোকিছু শুনবার আশায় কান পেতে আছে। তার এই অবস্থা ক্রমশ যেন আমাতেও সংক্রমিত হচ্ছে বলে মনে হল। বন্ধুর সেই কাল্পনিক অথচ গভীর সেই সংস্পর্কারগুলো এসে যেন আমাকেও গ্রাস করে ফেলছে। এ কথাটা আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম একদিন বিছানায় শুয়ে গভীর রাত্রিতে। লেডি মেডেলিনের কফিন সেই কক্ষে রেখে আসবার সাত কি আট দিন পরে। ঘন্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তবু আমার চোখে ঘুম নেই। আমার এই স্নায়বিক দুর্বলতার কারণটুকু খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম, হয়তো এ কামরার এইসব পুরনো আসবাবপত্রের বিষন্ন ভারি গান্ধীর্ঘই এর কারণ। ঘরের দেয়ালে গাঢ় রঙের দীর্ঘ পরদাগুলো বাতাসের ভারে কঁপিছে, মাথা কুটছে দেয়ালে আর নড়ে যাচ্ছে খাটের বিচিত্র নকশার ওপর। মনে হল এই দুঃসহ বিচিত্র পরিবেশই হয়তো আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কিন্তু বৃথা আমার এ যুক্তি। পরমুহুর্তেই আমার সারা শরীরে কিসের যেন এক শিহরণ বয়ে গেল। আর তার পরীক্ষণেই যেন সমস্ত সত্তা আমার কিসের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। খুব কষ্টে মোহাচ্ছন্ন এই অবস্থা

ঝেড়ে ফেলে বালিশে মাথা রেখে স্থিরচোখে চেয়ে রইলাম অন্ধকার কক্ষের বাইরে। আর ঠিক সেই অবস্থায় উদ্দাম ঝোড়া হাওয়ার সাথে একটা মান আর মৃদু। স্বর যেন আছড়ে পড়ল আমার বুকে। সে স্বরের উৎস কোথায় জানি না। সে স্বর আতঙ্কে আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে গেল। কল্পিত হাতে বুকের উপর থেকে কাপড়টা ঠেলে ফেলে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম মেঝের উপর। মনে হল, আজ রাতে না ঘুমানোই উচিত। দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়টাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে কামরার ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম।

এইভাবে কিছুক্ষণ পায়চারির পর হঠাৎ পাশের সিঁড়ি থেকে কারো মৃদু পদধ্বনি যেন আমার কানে ভেসে এল। উৎকর্ণ হয়ে কান খাড়া করে রইলাম সেদিকে। চিনতে পারলাম, এ আশারেরই পায়ের শব্দ। একটু পরেই আমার দরজায় এসে ও মৃদু টোকা দিল। তারপর আলো হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তার তেমনি বিবর্ণ, চোখজোড়া উন্মাদগ্রস্ত মানুষের মতো, শূন্য অথচ ভয়াল। মনে হল। তবু ভালো! এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে একজন মানুষের সান্নিধ্যের দাম অনেকখানি।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও দ্রুত উচ্চারণ করল, “দেখনি? এখনো দেখনি তুমি? একটু দাঁড়াও, সব দেখতে পাবো।” এই বলে হাতের বাতিটাকে সাবধানে আড়াল করে ধরে ও আবার এগিয়ে গেল। তারপর এক ঝটিকায় একটা জানলার শার্সি উন্মুক্ত করে ফেলল ঝড়ের মুখে।

বাইরের সেই দুরন্ত ঝড় ঘরের ভেতরে আছড়ে পড়ছে, যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আমাদের দুজনকে। ঝড়েরও যে কী অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি! তার উদ্দামতার সাথে সাথে অনুভব করলাম তার রহস্যময় অতুলনীয় সৌন্দর্য। হঠাৎ একেকটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠেছে। ঠিক এই জানালার কাছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে বারবার। হু হু করে বইছে এলোমেলো। আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। এত ঘন আর নিচু সে মেঘ যেন সমস্ত প্রাসাদকে মাটির সাথে চেপে ধরতে চায়। যেন এ এক প্রলয়েরই প্রতীক্ষা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম বিক্ষিপ্ত টুকরো মেঘ। আর হাওয়ার দুর্নিবার ছুটোছুটি। আকাশে তারা নেই, চাঁদ মেঘে ঢাকা। এমনকি বিদ্যুতের ঝিলিকও নেই। তবুও এই বিশাল মেঘের নিচে কোনো এক অজানা উৎস থেকে অপ্রাকৃতিক এক স্নান আলো এসে পড়েছে চতুর্দিকে। সে আলোতে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর এক রূপ নিয়েছে এই পৃথিবী, ঘনীভূত হয়েছে এই দুর্যোগ।

আশারকে টেনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতে দিতে আমি ভয়াত গলায় বলে উঠলাম, ‘না, না, ওসব দেখো না, দেখতে দেব না তোমাকে ওসব। এর ভেতরে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কেবল ঝড় উঠেছে একটা। কালো দিঘির জল হয়তো বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে মাতামাতি করছে। আমি জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। বড় বিপ্লী হাওয়া বইছে, তোমার শরীরের পক্ষে এই হাওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। তোমার প্রিয় একটা বই আমি পড়ছি শোনো। তুমি চুপচাপ শোনো। এভাবেই আমরা দুজনে কাটিয়ে দেব এই ভয়াল রাতটা।’ বলেই যে পুরনো বইটা আমি

তুলে নিলাম সেটা স্যর ল্যান্সলট কানিং-এর লেখা ‘ম্যাড ট্রিস্ট’। এটা যে ওর প্রিয় বই তা নয়। এর ভেতরে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে তার থেকে আমার বন্ধুর মানসিক অবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনেকখানি ভিন্ন। এই বইখানাই হাতের কাছে ছিল তাই তুলে নিয়েছিলাম। সামান্যতম দুরাশা আমার ছিল যে, এর থেকে অংশবিশেষ পড়লে (কেননা এ বইতে মানসিক বিশৃঙ্খলার এই ধরনের বর্ণনা আছে) এই বিকারগ্রস্ত মুহূর্তের কিছুটা লাঘব হতে পারে। যদি আমি বুঝতে পারতাম যে, ও এতখানি আগ্রহ নিয়ে শুনবে তাহলে নিশ্চয়ই নিজের বুদ্ধির জন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দিতাম।

যা হোক, পড়তে পড়তে আমি সেই জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে এই বইয়ের নায়ক ইথেলরেড শান্তির আশ্রমে প্রবেশের জন্য বৃথা চেষ্টায় রত। বইয়ের বিষয়টি এইরকম:

[সাহসী পুরুষ ইথেলরেড মদের ক্রিয়ায় আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল। সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপ করিবার ইচ্ছা আর তাহার নাই। কাঁধের উপর তাহার বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে, হৃদয় উদ্বেলিত। ঝড় আসিয়া পড়িবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া সে হস্তধৃত ষষ্ঠি শক্ত করিয়া ধরিয়া দরজার নিকটে আসিয়া দাড়াইল। এবং দীর্ঘ আবৃত বাহু দ্বারা সেই কাষ্ঠ-নির্মিত দরজায় সজোরে ধাক্কা দিল। সেই শব্দ, সেই ভয়াবহ ধ্বনি দূর অরণ্যের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া গেল।”]

এইটুকু পড়বার পর আমি একটু থামলাম। প্রাসাদের সুদূর কোণ থেকে ঠিক এই ধরনের একটা শব্দ যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক যে ধ্বনি ঐকেছেন স্যর ল্যানাসলটি তার বইতে, যেন ছবছ তারই প্রতিধ্বনি। বাইরে যে ঝড়, আর ভেতরে তার যে প্রমত্ত দাপদাপি, তার যে বিচিত্র ধ্বনি, তার সঙ্গে ‘ম্যাড ট্রিস্ট-এর এই অপূর্ব মিল হয়তো—বা আমার কলম্পনাপ্রসূত। তাই সেদিকে কোনো কান না দিয়ে পড়ে যেতে লাগলাম:

[“দুঃসাহসী ইথেলরেড দরজা অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসীর সকল নিষেধ উপেক্ষা করিয়া প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই স্বর্ণপ্রাসাদের সম্মুখে রৌপ্যচ্ছাদিত মেঝের উপর এক ভীষণাকৃতি ড্রাগন তাহার সম্প্রমুখে দাঁড়াইয়া। ড্রাগনের সমস্ত শরীরে আঁশের বর্ম এবং তাহার জিহ্বা হইতে লকলক করিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। আর তাহার পশ্চাতের দেয়ালে পিত্তল নির্মিত উজ্জ্বল ঢালের উপর নিম্নরূপ শ্লোক খোদিত রহিয়াছে:

“যিনি বীর কেবল তিনিই ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পরিবেন। এবং ড্রাগনকে হত্যা করিতে পারিলে এই ঢাল তাহারই হইবে।”

‘ইথেলরেড অতঃপর তাহার হস্তধৃত ষষ্ঠি তুলিয়া ড্রাগনের শিরে আঘাত করিল। ড্রাগন রক্ত হিম-করা বিকট আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং মৃত্যুবৎ সম্মুখে পড়িয়া গেল। ইথেলরেড আতঙ্কিত হইয়া, এই অশ্রুতপূর্ব আর্তনাদ শুনিয়া দুই হাতে আপন কান চাপিয়া ধরিল।’]

আবার আমি থামলাম। মুহূর্তের মধ্যে চরম বিস্ময়ের সাথে স্পষ্ট শুনতে পেলাম এক ভয়াবহ আর্তনাদের শব্দ। প্রাসাদের কোন অংশ থেকে এ শব্দ ভেসে এল জানি না। মনে হল এই কর্কশ স্বর, মৃত্যুকালীন এই আর্তনাদ যেন সেই উপন্যাসবর্ণিত ড্রাগনেরই।

দ্বিতীয় বারেও ঘটনার সঙ্গে এই অভাবিত মিল আমাকে বিমূঢ় করে দিয়ে গেল। সারা শরীরে আমার আতঙ্ক আর বিস্ময়ের হিমশ্রোত বয়ে গেল। তবুও জোর করে আমি সেই আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লগলাম। এই আর্তনাদ আশার শুনতে পেয়েছে কিনা জানি না। তবে লক্ষ করলাম, গত কয়েকমিনিটের মধ্যে তার মুখের ভাব অনেকটা বদলে গেছে। প্রথমে ও আমার মুখোমুখিই বসে ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে চেয়ার ঘুরিয়ে নিল ও। ওর মুখ এখন কামরার দরজার দিকে। আমার আসন থেকে যদিও তার চেহারা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবুও বুঝতে পারছিলাম, ও এখন অস্পষ্ট স্বরে কী যেন উচ্চারণ করছে। ওর মাথা বুকো পড়েছে সামনের দিকে বুকোর উপর। কিন্তু চোখজোড়া খোলা। প্রথমে ঘুমিয়ে আছে বলে মনে হলেও চোখ দেখে পরে এ ভুল ভেঙে গেল। তাছাড়া সারাঙ্গণই সমান তালে ডাইনে-বায়ে মৃদু মৃদু দুলছে ও। এই মুহূর্তে ওকে ডেকে তুলে আমি আবার পড়তে শুরু করলাম:

[‘অতঃপর জয়ী ইথেলরেড সেই আতঙ্ক দূরে ফেলিয়া, ড্রাগনের মৃতদেহ একপার্শেই সরাইয়া রাখিয়া সেই ঢালের দিকে অগ্রসর হইল। নিকটবর্তী হইবামাত্র ঝনঝন শব্দ করিয়া রৌপ্যের মেঝের উপর ঢালটি পড়িয়া গেল। এবং কণ্ঠবিদ্যাবী শব্দে সমস্ত কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।’]

শেষ লাইনটি আমার মুখ থেকে বেরুতে-না-বেরুতেই দূরে কোথাও সেই ঢাল পড়ে যাবার ঝন ঝন শব্দ আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। ধাতুর আঘাতজনিত সে শব্দ যেন আমার বুকোর ভেতরে এসে আছড়ে পড়ল। তার প্রতিধ্বনি আমার ধর্মনির রক্ত হিমশীতল করে দিয়ে গেল। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

আশার কিন্তু ঠিক আগের মতোই নির্বিকারভাবে দোল খাচ্ছে। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেলাম। দৃষ্টি ওর সম্মুখে প্রসারিত আর সারাটা মুখ প্রস্তুতকঠিন। কাঁধে হাত রাখতেই ওর সারাটা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠল। ঠোঁটের কোণে। অত্যন্ত নিচুগলায় সে এমনভাবে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করল, যেন ও নিজেকেই বলছে কিছু। ওর মুখের কাছে বুকো পড়ে শুনতে পেলাম ও বলছে:

‘এখন শুনতে পেয়েছ? আমি আগেও শুনেছি, এখনো শুনছি। অনেক— অনেকদিন ধরে প্রতিটি মুহূর্তে আমি শুনে চলেছি। তবু আমি সাহস করিনি। না, না, আমি পাগল হয়ে যাব।— আমি একটা কথাও সাহস করে উচ্চারণ করিনি কোনোদিন। আমরাআমরা— তাকে সেই কক্ষে রেখে দিয়েছি— হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আর আমি। আর আমি— ইহা আমি নিজে তার অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি। অনেকদিন আগেই শুনেছি, কিন্তু এতদিন বলিনি কাউকে। আর আজ রাতে ইথেলরেড— হাঃ হাঃ— সে দরজা খুলে ঢুকেছে, তারপর ড্রাগনের চিৎকার আর সবশেষে ঢাল পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম। তার চেয়ে বলো মেডেলিনের কফিনের ডালা খোলার শব্দ। তারপর কারাগারের লৌহকপট খোলার বিকট আওয়াজ। হাঃ হাঃ, তামা দিয়ে মোড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে তার ছুটোছুটির শব্দ আমরা

শুনতে পেয়েছি। উহ! কোথায় আমি পালাব! কোথায় যাব? সে তো এক্ষুনি এখানে আসবে আমাকে তিরস্কার করতে। সে কি এগিয়ে আসছে? সিঁড়ির উপর তার পায়ের শব্দ কি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তার চাপা নিশ্বাস পতনের শব্দও আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।” এটুকু বলেই ও ভীষণ বেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেন ওর প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায়, এমনভাবে ও চিৎকার করে উঠল, “ওই যে, দরজার বাইরে সে এসে দাঁড়িয়েছে।”

যেন সেই উচ্চারণের আঘাতে, এক অনৈসর্গিক শক্তিতে দরজার পুরনো কালো পাল্লা উন্মুক্ত হয়ে গেল। বাইরের দুরন্ত বাতাসে দরজাটা সম্ভবত খুলে গেছে। কিন্তু এ কী! বাইরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক আবৃত লেডি মেডিলিনী! তাঁর সাদা কাপড়ের উপর রক্তের দাগ। আর কৃশ তনু তাঁর ক্ষতবিক্ষত। মুহূর্তকালের জন্য তিনি চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে খরখর করে কাঁপতে লাগলেন। তার পরমুহূর্তেই মৃদুস্বরে একটা আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়লেন তার ভাইয়ের গায়ের উপর। দারুণ উৎকণ্ঠায় কেমন যেন হয়ে গিয়ে আশারও কান্ত হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। ভয় আর নিদারুণ এক আতঙ্ক, যা তাকে এতদিন ভর করেছিল, আজ তা তাকে নিমেষে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আর আমি? সেই কক্ষ থেকে, সেই প্রাসাদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখনো ঝড়ের উন্মত্ত দাপদাপি। সহসা আমার সমুখের পথ আলোকিত হয়ে গেল। কোথায় এর উৎস? আমার পেছনে প্রাসাদের বিরাট ছায়া পড়েছে। তাকিয়ে দেখি আকাশে চাঁদ উঠেছে বিরাট। আর রক্তের মতো তার আভা এসে ঠিকরে পড়ছে আমার চারদিকে। এ গল্পের শুরুতে, প্রাসাদের কার্নিশ থেকে জমিন অবধি যে ফাটলটির কথা বলেছিলাম, দেখলাম সেই ফাটলের ভেতর দিয়ে সেই নিষ্ঠুর রক্তবর্ণ চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে সেই ফাটল প্রসারিত হতে লাগল। হঠাৎ কোথা থেকে এল প্রচণ্ড এক ঝোড়ো হাওয়া। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখি, প্রাসাদটা ভেঙে গুড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দেয়ালগুলো ধ্বসে যাচ্ছে একে একে। আর সেইসঙ্গে এক অদ্ভুত শব্দ উঠছে চারদিক থেকে। উন্মত্ত জলরাশির প্রচণ্ড শব্দ। পায়ের কাছে সেই কালো দিঘির জল আশার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষটুকু ধীরে ধীরে গ্রাস করছে নিঃশব্দে!

কালো বিড়াল

সবচেয়ে অসাধারণ অথচ ঘরোয়া যে ইতিবৃত্তটি লিখতে যাচ্ছি, সে ইতিবৃত্তে আপনাদের বিশ্বাস জন্মানোর যেমন চেষ্টা করব না, ঠিক তেমনি আমার এ আখ্যায়িকার সত্যাসত্য আপনাদের যে বিশ্বাস হবে তা-ও আশা করিনে। যে ব্যাপারে আমার নিজেরই জ্ঞানবুদ্ধি কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না। তাতে আপনাদের বিশ্ববাসটুকু আশা করাও পাগলামির নামান্তর। তবু বলব, আমি পাগল তো নই-ই, এমনকি স্বপ্নের ঘোরে যে আছি তা-ও নয়। তবে আজ আছি কাল নেই। তাই ইচ্ছে করে আমার অন্তরের যা কিছু উজাড় করে দিয়ে যাই। তাই সংক্ষেপে এবং সাধারণ কথায় নেহাত ঘরোয়া কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করব। কোনো মন্তব্য বা কোনো জটিলতা এ বর্ণনার মধ্যে না আনাই আমার ইচ্ছে। এই সাদামাটা অতি সাধারণ ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া আমাকে ভীত, বিমর্ষ করে তুলেছে। আমাকে একেবারে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। তবু আমি তাদের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব না। আমি জানি এ ঘটনাগুলো আমার মনে শুধু বিভীষিকার সৃষ্টি করলেও পাঠকের মনে হয়তো ততটা প্রতিক্রিয়া না-ও ঘটাতে পারে। কোনো কোনো বিচক্ষণ পাঠক হয়তো আমার এই বিভীষিকার মধ্যে শুধু সাধারণ ঘটনাপরম্পরার যোগাযোগটুকুই খুঁজে পাবেন, আবার কেউ-বা আরো ধীরস্থির বুদ্ধিতে আবার উত্তেজনার কারনগুলোকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে অনেকটা লঘু করতেও পারবেন। আমার বর্ণিত এই ভয়াল কাহিনীর মধ্যে হয়তো তাঁরা শুধু মামুলি কয়েকটি সাধারণ ঘটনার কার্যকারণ এবং তাদের প্রতিক্রিয়াটুকু নিয়েই একটি সাধারণ ইন্দ্রিয়জ সিদ্ধান্তেই নেমে আসবেন।

ছেলেবেলা থেকেই শান্তশিষ্ট এবং মমতাসীল বলে আমার একটা নাম ছিল। আমার এই সংবেদনশীল মনের জন্যে সঙ্গীদের কাছে প্রায়ই আমাকে বিদ্রাপের পাত্র হতে হত। বিশেষ করে জন্তু-জানোয়ারের প্রতি আমার একটা মমত্ববোধ ছিল। ঠিক এইজন্যেই বোধ করি, বাবা-মা আমাকে নানারকম গৃহপালিত পশু পুষতে বেশ উৎসাহ দিতেন। তাদের নিয়েই আমার সময় কাটত। তাদের খাওয়ানো, সেবাযত্নের মধ্যে দিয়ে যে তৃপ্তি পেতাম, আর কোনো কাজে তা পেতাম না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার চরিত্রের এই অসাধারণত্ব ক্রমে বেড়েই উঠতে লাগল এবং শেষে এই অসাধারণত্বের মধ্যেই আমি যেন বিচিত্র এক আনন্দের উৎস খুঁজে পেলাম। আমার এ আনন্দ যে ঠিক কী ধরনের তা ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। শুধু এটুকু বললেই হবে, কোনো লোক তার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত কুকুরের জন্যে যে ধরনের মমতা বোধ করেন এবং সেই মমতাবোধ থেকে যে ধরনের তৃপ্তি লাভ করেন, আমার এই তৃপ্তিও অনেকটা তেমনি। জন্তু-জানোয়ারের নিঃস্বর্ষ ও প্রাণচালা ভালোবাসার মধ্যে এমন একটা কিছু পরশ

পাওয়া যায়, যা সোজাসুজি অন্তরকে স্পর্শ করে। মানুষের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা যেন এর কাছে মান হয়ে যায়।

অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলাম এবং ঠিক আমার নিজের মতোই আমার স্ত্রীর মধ্যেও এই বিশেষ গুণটির লক্ষণ দেখে বেশ খুশি হয়েছিলাম। সেও পশুপাখি বড় ভালোবাসত। পোষা জন্তু-জানোয়ারের প্রতি আমার মমতা দেখে আমার স্ত্রী বেশ কয়েকটি মনের মতো পশুপাখি জোগাড় করতে দেরি করেনি। পাখি, লালমাছ, একটি চমৎকার কুকুর, কয়েকটি খরগোশ, একটি ছোট্ট বাঁদর আর একটি বিড়ালও ছিল আমাদের।

বিড়ালটি আকারে অতিকায় এবং অত্যন্ত সুন্দর। গায়ের রং একেবারে মিশমিশে কালো। আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল বিড়ালটির। তার এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা চতুরতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমার স্ত্রী প্রায়ই বলত— প্রবাদে যে আছে সব কালোবিড়ালই এক একটি ছদ্মবেশী প্রেতবিশেষ, কথাটা ঠিক। বলাবাহুল্য আমার স্ত্রী মোটেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল না। তবে সে যে এ বিষয়ে কোনোই গুরুত্ব আদৌ দেয়নি তা না বললেও চলে। এ বিষয়ে আমার যা মনে পড়েছে, শুধু সেটুকুরই পুনরাবৃত্তি করলাম মাত্র।

বিড়ালটির নাম রেখেছিলাম প্লুটো। পোষ্যদের মধ্যে সে-ই আমার প্রিয় ছিল। হ্যাঁ, প্রিয় সঙ্গী বলা চলে। তাকে আমিই শুধু খাওয়াতাম। বাড়ির যেখানেই যাই, সে আমার পিছু ছাড়ত না, একমুহূর্তের জন্যেও না। এমনকি পথে বেরুলেও সে আমাকে অনুসরণ করতে ছাড়িত না, তখন অনেক কষ্টে তাকে তাড়াতে হত।

এইভাবে বহু বছর আমাদের অন্তরঙ্গতা টিকে ছিল। এরই মধ্যে পাশবিক মনোবৃত্তিজনিত অমিতাচারের ফলে আমার চারিত্রিক ও মনোগত পরিবর্তন বেশ খানিকটা ঘটেছিল। এখন সেটা একেবারে চরমে গিয়ে উঠল। দিনকে দিন আমি বেশি-খেয়ালি, বিরক্ত আর অপরের প্রতি সামান্য কারণে বা অকারণেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম। স্ত্রীর প্রতি কটুকথা বলে ফেলে নিজেরই মনে কষ্ট হত। শেষে এমনও ঘটল, তাকে আমি মেরে বসলাম। অবশ্য আমার পোষা পশুপাখিরা আমার প্রকৃতির মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তনের ব্যাপারটুকু আগেই টের পেয়েছিল। হঠাৎ কুকুরটা, খরগোশগুলো বা বাঁদরটা আমার সামনে পড়ে গেলে ওদের ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করতাম সত্যি, কিন্তু প্লুটোর বেলায় অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতাম। ক্রমে আমার অসুখটা বেড়ে চলল। অসুখটা যেন আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত। এ যেন মদের নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসেছে। শেষকালে পুটোও আর বাদ পড়ল না। সে বেশ বুড়ো ও ইদানীং একটু কোপনস্বভাব হয়ে উঠেছিল। এখন থেকে সে-ও আমার রগচটা প্রকৃতির পরিচয় পেতে লাগল।

রাত্রিবেলা শহরের কোনো এক আড্ডাখানা থেকে মদে চুর হয়ে বাড়ি ফিরেছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম, বিড়ালটি আমাকে দেখেই যেন ফস করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। খপ করে ওর গলাটা চেপে ধরে ফেললাম। ভয়ে সে

হাঁচড়পাঁচড় করতে করতে আমার হাতটায় সামান্য দাঁত বসিয়ে দিলে। হঠাৎ কী এক পাশবিক ইচ্ছা আমাকে যেন ভর করল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। মনে হল যেন আমার নিজস্ব আত্মটুকু একমুহুর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার বদলে এক ভয়ঙ্কর সর্ষপরায়ণ কুপ্রবৃত্তি আমার সর্বশরীরের স্নায়ুতে স্নায়ুতে শিহরণ দিয়ে গেল। ওয়েস্ট কোর্টের পকেট থেকে ছোট একটা ছুরি বার করে খুলে নিলাম। বিড়ালটিকে গলা টিপে ধরে তার একটা চোখ চাকু দিয়ে খুবলে কেটে বার করে দিলাম। এই চরম নিষ্ঠুরতার কথা আজ লিখতে বসে আমি অবাক হয়ে যাই, উত্তেজিত হয়ে উঠি, শিউরে উঠি।

সকাল। গতরাতের অমিতাচারজনিত উত্তেজনার আর চিহ্ন নেই। ঘুমের মধ্যেই সেসব যেন ধুয়েমুছে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে গতরাতের নিষ্ঠুর কাজটির কথা মনে পড়তেই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমার কুকর্মের জন্যে নিদারুণ অনুতাপ হল। কিন্তু যতদূর মনে হয় আমার এই অনুতাপের মনোভাবে কোনো গভীরতা ছিল না। একে আন্তরিক কখনোই বলা যায় না। কারণ আমি আবার মদের মধ্যে ডুবে গেলাম। তখনই আবার আমার কৃতকর্মের যা কিছু স্মৃতি সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্লুটো ধীরে ধীরে সেরে উঠল। এখন তাকে দেখে মনে হয় চোখের জন্যে তার আর কোনো যন্ত্রণা নেই। কিন্তু তার চক্ষুহীন অক্ষিকোটরটির দিকে তাকানো যায় না। বীভৎস। সে আগের মতোই বাড়ির সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়ায় কিন্তু আমার সাড়া পেলেই অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। যে প্রাণীটি আমাকে এত ভালোবাসত সে-ই আমাকে এখন এত অপছন্দ করে, একটুও বরদাশত করতে পারে না দেখে আমার খুব দুঃখ হত। তখন সেই মুহূর্তটিতে নিজেকে আবার সেই আগের মমতাসীল মানুষটির মতোই মনে হত। কিন্তু মনের এই অবস্থটুকু বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। শেষে একটা অনমনীয় একগুঁয়েমি ভোবই যেন আমায় পেয়ে বসল। অদ্ভুত এই যে, এই মনোভাবের কোনো কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কোনো যুক্তিতর্ক দিয়ে একে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারা যায় না।

এই যে মাথা-পাগলা একটা জেদ, এটা আমার সহানুভূতিশীল মনকে যেন নিঃশেষে শুকিয়ে দিয়েছিল। মনের এই বিপথগামী গতি মানুষের হৃদয়ের আদিম মনোবৃত্তিরই স্বরূপ। এই মনোবৃত্তি বা অনুভূতিই পূর্ণ ও প্রকটভাবে আমাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করে।

এমন অনেককেই দেখা যায়, কোনো একটা গর্হিত কাজ করছে কিন্তু তার ওই কুকর্মের হয়তো কোনো কারণই নেই। তার হয়তো মনে হয়েছিল কাজটি তার আদৌ করা উচিত নয়। ব্যস এটুকুই। কিন্তু মনের দরজায় কোনো সতর্ক প্রহরী না বসানোর ফলেই বাইরের দরজা দিয়ে যা কিছু অন্যায়ে ভেতরে চলে এসেছে আর তখুনি মন ওটা করবার জন্যেই আকুল হয়ে উঠেছে। এই যে মনোভাব, এটিই আমার শেষ পতনকে যেন আরো স্বরাধিত করেছিল। এটা সেই দুর্দমনীয় পিপাসা,

যে পিপাসা আমার নিজের সংবেদনশীল মনের বিরুদ্ধে, নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত, উদ্ভুদ্ধ করেছিল। অন্যায় করার ইচ্ছাতেই আমি সেই অবলা জীবটির ওপর অত্যাচার চালিয়েই গিয়েছি। একদিন সকালে সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবেই বিড়ালটির গলায় দড়ির একটা ফাঁস লাগিয়ে গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে দিলাম। অশ্রুসিক্ত চোখে তার এই নিদারুণ মৃত্যু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মর্মপীড়ায় নিজেই দগ্ধ হলাম। তাকে ফাঁসি দিলাম, কারণ সে আমাকে ভালোবাসত; তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলাম, কারণ আমি জানতাম আমার দুস্পকর্মের কোনোই যুক্তি নেই। তাকে ফাঁসি দিলাম, কারণ আমি বুঝেছিলাম আমার এই কাজটা আসলে একটা মহাপাপ হচ্ছে, যে মহাপাপ আমার মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মাকে হয়তো বিপন্ন করবে এবং পরম দয়ালু আর চরম ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে।

যেদিন প্লুটোকে এভাবে গাছে ঝুলিয়ে মারলাম সেই রাতে একটা ঘটনা ঘটল। আগুনের হলকায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের পরদাগুলোয় তখন আগুন ধরেছে। সমগ্র বাড়িটাই দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। অতি কষ্টে আমি, আমার স্ত্রী ও একটি চাকর কোনোক্রমে আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলাম। পুড়ে সব শেষ হয়ে গেল। পার্থিব যা কিছু সম্পদ, আমাদের সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সর্বস্ব হারিয়ে মুষড়ে পড়লাম।

আমার নিষ্ঠুর কাজ ও এই দাবানলের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা কার্যকারণ সম্বন্ধ কল্পনা করার মতো দুর্বলতা আমার ছিল না। আমি শুধু কয়েকটি ঘটনা ঠিক যেমন যেমন ঘটেছিল তেমনিভাবেই লিখে যাচ্ছি। ঘটনাপরম্পরার কোনো সম্ভাব্য যোগাযোগকে ইঙ্গিত করা আমার ইচ্ছে নয়।

অগ্নিকাণ্ডের পরের দিন। আমাদের বাড়ির ধ্বংসস্তুপের কাছে গিয়েছি। বাড়ির সব দেয়ালগুলোই ভুমিসাৎ হয়েছে। বাড়ির মধ্যখানে আমার শোবার ঘরের একটি অপেক্ষাকৃত পাতলা দেয়াল শুধু দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়ালটির দিকেই মাথা করে আমি শুতাম। সম্প্রতি এই দেয়ালটিতে নতুন করে বালি-কাজ করা হয়েছিল। খুব সম্ভব সেজন্যেই লক্ষ করলাম, দেয়ালটি আগুনকে যেন বেশ খানিকটা রোধ করতে পেরেছে। দেখলাম, দেয়ালটির কাছে অনেক লোক জড়ো হয়ে কী দেখছে। কেউ কেউ আবার অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে মনোযোগ দিয়ে দেয়ালটির জায়গাবিশেষ পরীক্ষা করছে। কেউ বলছে 'আশ্চর্য, আবার কেউ— বা “অদ্ভুত” “অদ্ভুত” বলে চিৎকার করছে। ওদের এই ধরনের কথাবার্তায় আমিও কৌতুহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, সাদা দেয়ালের গায়ে জলছবির মতো আবছা একটি ছবি, বিরাট একটা বিড়ালের প্রতিকৃতি। বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত নিখুঁত প্রতিকৃতিটি। বিড়ালটির গলায় একটা দড়ির চিহ্নও রয়েছে।

প্রথম দেখামাত্রই এ দৃশ্য ভৌতিক ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিভূত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে

লগলাম। পরিষ্কার মনে পড়ল বাড়ির পাশেই বাগানের একটি গাছের ডালে বিড়ালটিকে গলায় দড়ি দিয়ে বুলিয়ে মেরেছিলাম। বাড়িতে যখন আগুন লাগে সে সময়ে প্রতিবেশীরা অনেকেই এই বাগানের মধ্যে এসে জড়ো হয়েছিল। খুব সম্ভব, এদের মধ্যেই কেউ মৃত বিড়ালটিকে দড়ি কেটে গাছ থেকে নামিয়ে আবার শোবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ছুড়ে ফেলেছিল। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ঘুম থেকে আমাকে জাগানো। আমার ধারণা এই অবস্থাতে পাশের দেয়ালের পতনের ফলে খুব সম্ভব মৃত বিড়ালটি অক্ষত দেয়ালটির পলস্তারার সাথে চেপ্টে পিষে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলেই দেয়ালের চুন ও জাস্তব্য দেহের অ্যামোনিয়ার সংমিশ্রণে আর আগুনের তাপে হয়তো এইভাবে একটা নিখুঁত প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

এভাবে আমার যুক্তিতর্ক অনুযায়ী ব্যাপারটির একটা সুস্বল্প ব্যাখ্যা খাড়া করলেও আমার বিবেকের কাছে এই ব্যাখ্যাটা খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। দৃশ্যটা বেশ গভীরভাবেই আমার মনকে আলোড়িত করেছিল। মাসাধিক কাল ধরে এই বিড়াল বিভীষিকাকে মন থেকে দূর করতে পারিনি এবং ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে অদ্ভুত এক অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু এ অনুভূতি যে আমার কৃতকর্মের মনোপীড়াজনিত, তা নয়। শেষপর্যন্ত এতদূর মনটা খারাপ হয়ে গেল যে, বিড়ালটির অভাব আমি নতুন করে আবার অনুভব করতে লাগলাম। যেসব বাদ আড্ডায় আমি ঘুরে বেড়াই, সবখানেই ঠিক পুটোর মতোই আর একটি বিড়ালের সন্ধান করে ফিরতে লাগলাম। আমার এমন একটি বিড়াল চাই, যে পুটোর মতোই হবে, তারই পরিত্যক্ত স্থান জুড়ে বসবে আমাদের মাঝে।

এক রাত্রির ঘটনা। প্রায় বেহুঁশ হয়ে একটি নোংরা আড্ডায় বসে ছিলাম। আসবাবপত্র বলতে ঘরে শুধু মদের বড় কটা পিপেই ছিল। হঠাৎ একটা পিপের উপর কালে কী একটাকে বসে থাকতে দেখলাম। একদৃষ্টি পিপেটার দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ লক্ষ্যবস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলাম। কাছে গিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। বিরাট একটি কালো বিড়াল, ঠিক পুটোর মতোই। কিন্তু একটি ব্যতিক্রম ছিল ওর শরীরে। ক্ষীণ অথচ বিস্তৃত একটি সুস্বল্প সাদা দাগ বিড়ালটির প্রায় গলা জড়িয়ে বুক পর্যন্ত বেষ্টন করে আছে। বিড়ালটিকে ছুতেই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে শব্দ করতে করতে আমার হাতে মাথা ঘষতে লাগল। মনে হল, আমাকে দেখে সে যেন খুশি হয়ে উঠেছে। এতদিনে যেন হারানো মানিক খুঁজে পেলাম। বাড়িঅলাকে ধরলাম, বিড়ালটি আমার কাছে বিক্রি করতে হবে। সে তো অবাক! বিড়ালটি তার তো নয়ই, এমনকি কার বা কোথা থেকে এসেছে, তা-ও সে জানে না। এর আগে ওটাকে সে দেখেওনি।

বিড়ালটির মাথায় পিঠে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। বাড়ি যাবার সময় দেখি, সে আমার সঙ্গ নিয়েছে। আমি তাকে বাধা দিলাম না। যেতে যেতে মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বাড়ি

পৌছেই দেখা গেল, বিড়ালটা চটপট পোষ মেনে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত ন্যাওটা হয়ে পড়ল।

আগে যা অনুমান করা গিয়েছিল এটাকে ঠিক তার বিপরীত মনোভাব বলা যায়। কিন্তু বুঝতে পারতাম না, কেন এমন হল। দেখা গেল বিড়ালটি সব সময়েই আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়। এতে করে আমার বিরক্তি লাগতে শুরু করল। শেষে এই বিরক্তি ধীরে ধীরে নিদারুণ ঘৃণায় পরিণত হল। ওকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম আমি। আমার আগের নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়ায় বেশ লজ্জিত বোধ করতাম নিজেকে। বিড়ালটির ওপর কোনো অত্যাচার করা থেকে নিজেকে সংযত রাখতাম। বেশ কিছুদিন ওকে কোনো মারধোর করিনি। কিন্তু ক্রমশ তাকে দেখলেই অকথ্য ঘৃণার ভাব মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠতে শুরু করল। তার উপস্থিতিকেই বিরক্তিকর মনে হতে লাগল। তার চেহারাকে সংক্রামক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই মারাত্মক মনে হত। অতি সাবধানে তাকে এড়িয়ে যেতাম।

বিড়ালটাকে বাড়িতে আনার পরিদিন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছিলাম, ঠিক প্লুটোর মতোই তারও একটি চোখ কানা। কী জানি কেন, এর ফলে তার ওপরে আমার ঘৃণাটুকু আরো বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিড়ালটি কানা বলেই অথবা সবদিক থেকেই প্লুটোর মতো দেখতে বলেই বোধহয় আমার স্ত্রী তাকে আরো বেশি গভীরভাবে আদর যত্ন করতে লাগল। অবলা জন্তু-জানোয়ারদের প্রতি আমার স্ত্রীর এই ধরনের মমতাবোধ আগে থাকতেই ছিল। আমারও আগে এই বিশেষ গুণটি ছিল; আর এই প্রবৃত্তির জন্যে অনেক সময়ে সহজ ও অনাবিল আনন্দ বলতে যা বোঝায় তার পূর্ণ আনন্দও পেয়েছি। কিন্তু এখন সে অনুভূতি আমার মধ্যে আর নেই। দেখা গেল বিড়ালটিকে আমি যতই বরদাশত করতে পারছি না, সে-ও ঠিক সেই অনুপাতে যেন আমাকে পেয়ে বসছে। সে যে কী অদ্ভুত আদুরে হয়ে আমাকে সবসময়ে অনুসরণ করত তা আপনারা বুঝে উঠতে পারবেন না। হয়তো কোথাও বসেছি, দেখা গেল ঠিক আমার চেয়ারের নিচে সে বসে আছে। কোনো কোনো সময়ে সে আবার লাফিয়ে আমার কোলে উঠে বসত। তারপর চলত তার আল্লাদের বহর। ঘৃণায় আমার গা রি-রি করে উঠত। উঠে চলে যাচ্ছি, দেখা গেল সে তখন আমার দুপায়ের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। সময় সময় পায়ে পা জড়িয়ে আছাড় খাবার উপক্রম হত। মাঝে মাঝে আমার কাপড়ে আবার তীক্ষ্ণ নখ আটকে দিয়ে হাঁচড়পাচড় করে সোজা বুকুর কাছে উঠে আসত। মনে হত, একটা ঘায়ে ব্যাটাকে শেষ করে দিই, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতাম। অতীতের নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়ে যেত। আর সত্যি কথা বলতে কী, বিড়ালটিকে দেখলেই আমি এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম যে, তার কোনো ক্ষতি করার সাহসই হত না আমার।

এই যে আমার আতঙ্কিত ভাব এটা কিন্তু নিজের কোনো শারীরিক ক্ষতির ভয়ে নয়। তবু ঠিক কেন যে এমনটি হত, তা আমি বোঝাতে পারব না।

বলতে লজ্জা হয়, এই বিকটাকার জীবটি ও তার হিংস্র আচরণ আমার মধ্যে যে কী ধরনের বিভীষিকা ও ত্রাসের সঞ্চার করছিল তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ওর গলার কাছে যে সুস্বাদু সাদা দাগটি ছিল সে বিষয়ে আমার স্ত্রী অনেকবারই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমি আগেই বলেছি এই দাগটুকুই একমাত্র যা প্লুটোর ছিল না। অন্য কোনো বিষয়েই এই রহস্যময় জীবটির সাথে প্লুটোর বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না। প্লুটোকে আমি নিজের হাতে মেরে ফেলেছি। পাঠকের হয়তো মনে হচ্ছে, এই সাদা দাগটি বড় হলে অত্যন্ত আবছা মনে হবার কথা। কিন্তু পাঠক হয়তো আমাকে পাগল ঠাওরাবেন, যদি বলি ওই আবছা দাগটুকু ধীরে ধীরে অত্যন্ত প্রকট, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। বলতে গিয়ে শিউরে উঠি; ঘুণায়, ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। অদ্ভুত, অদ্ভুত ওই দাগটা। গলার চারদিকে স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠা। ঠিক, ঠিক যেন ফাঁসির একটা দড়ি, গলায় চেপে বসে আছে। তাকানো যায় না, মৃত্যুশীতল অসহ্য যন্ত্রণা, অসহ্য ত্রাসের প্রতীক যেন আমার চোখের সুমুখে জেগে ওঠে।

সামান্য একটা জীব, তুচ্ছ একটা বিড়াল এমনি করে আমার দেহ-মনকে বিভীষিকার বিষে কুকড়ে দিচ্ছে, আমার মনুষ্যত্বকে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিচ্ছে। আমাকে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে রসাতলে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। মানুষ হয়ে আমি কিনা একটা পশুর কাছে হীনতম, তুচ্ছতম একটা জীবে পরিণত হয়েছি। দিনরাত যখনই ভাবি, মনে হয়, আমার শান্তি নেই, সুখ নেই। ভয়, শুধু ভয় আর ত্রাসের তুহিন শীতল অস্থিরতা। প্লুটো সবসময়েই আমার সাথে সাথে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এ বিড়ালটা তার চেয়েও ভীষণ। হয়তো হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছি, দেখি বুকের উপর সে চেপে বসে আছে। তার গরম নিশ্বাস আগুনের হালকার মতো মুখে এসে লাগছে। জলজ্যাস্ত দুঃস্বপ্নের মতো বিকটাকার বিড়ালটিকে বুকের উপর থেকে নিচে ফেলে দেবার মতো জোরও যেন পাইনে। বুকের উপর চেপে বসে চিরতরে ও যেন আমার হৃদয়ের একটা বিরাট বোঝা হয়ে থাকতে চায়। উহ কী অসহ্য যন্ত্রণা!

আমার মধ্যে সুপ্রবৃত্তির যে ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু আজো অবশিষ্ট ছিল, এই অসহ্য যন্ত্রণার আগুনে তা যেন নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কুচিন্তা যেন ক্রমাগত ছায়ার মতো আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বভাবসুলভ। খেয়ালি মন আমার সবার ওপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। কোনো মানুষকেই আমার আর বরদাশত হত না— ঘুণা হত। এই মানসিক প্রলয়ঙ্কর দুরবস্থায় আমার দিগ্বিদিক, স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান থাকত না। বলতে কষ্ট হয়, আমার এই মানসিক প্রলয়ঙ্কর দুরবস্থায় আমার চোটপাট সবই প্রায় স্ত্রীর ওপরই গিয়ে পড়ত। আমার উচ্ছঙ্খলতায় বেচারী জর্জরিত হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা বেশ চরমে উঠেছিল। পুরনো বাড়িতেই আমরা বসবাস করছিলাম। একদিন ভাড়ারঘরে কী একটা জিনিসের খোজে যাচ্ছি, স্ত্রীও সঙ্গে রয়েছে। বিড়ালটিও দেখলাম ঠিক আমার পেছনেই

সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। পায়ে পা জড়িয়ে প্রায় আছাড় খাবার জোগাড়। মাথায় আমার আগুন চেপে গেল। সব ভুলে গেলাম, পরে কী ভীষণ কাণ্ড ঘটে পারে তা একবারও মনে এল না। একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে সজোরে বিড়ালটির মাথায় ঘা বসিয়ে দিতে উদ্যত হলাম। কুড়ুলটা ওর মাথায় পড়লে আর রক্ষা ছিল না। কিন্তু তা আর হল না। আমার স্ত্রী খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল। বাধা পেয়ে রাগে, উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে গেলাম। কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। দানবের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। কুড়ুল—সুন্দ্র হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই স্ত্রীর মাথার ঠিক মধ্যখানে দিলাম এক কোপ বসিয়ে। একটা টুশব্দ পর্যন্ত না করে সে পড়ে গেল মাটিতে।

জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। এখন আর কোনোই উপায় নেই। যে করেই হোক লাশটা লুকিয়ে ফেলতে হবে, তবেই রক্ষা। ভালো করেই জানতাম বাইরে নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেলবার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। রাতেই হোক আর দিনেই হোক, প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলবে। মাথায় অনেকরকম মতলবই আসতে লাগল। একবার মনে হল লাশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে ফেলে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলি। আবার তখুনি মনে হল। ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে গর্ত করে ওটাকে পুঁতে ফেললেই ভালো হয়। আবার মনে হল, ওটাকে উঠোনের পাতকুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়া যাক ইত্যাদি। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে মতলবটি এল সবগুলোর চেয়ে এটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। মধ্যযুগের তান্ত্রিকরা যেমন করত। আমিও তেমনি করব ঠিক করলাম। লাশটাকে দেয়ালের মধ্যে গঁথে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই ধরনের কাজের জন্যে ভাড়ারঘরটিকে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা বলা যায়। এর দেয়ালগুলো নড়বড়েভাবে গাঁথা। আবার নতুন করে যে বালির কাজ করা হয়েছে, তা-ও সঁাৎসঁেতে অবস্থায়, ভালো করে শুকোয়নি, খানিকটা নরম রয়েছে। দেয়ালের গায়ে একটা ধোয়া বেরুবার চিমনির চিহ্ন রয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অগ্নিকুণ্ডের জায়গাটা ভরাট করে ফেলে এটাকে পুরোদস্তুর একটা ভাড়ারঘরে পরিণত করা হয়েছে।

নড়বড়ে দেয়ালটার কয়েকটা ইট সরিয়ে নিয়ে তার মধ্যে যে লাশটাকে ভরে দিয়ে আবার দেয়ালটাকে পরিষ্কার গঁথে দিতে পারব, তাতে আমার কোনোই সন্দেহ রইল না। নিখুঁতভাবেই আবার দেয়ালটিকে মেরামত করে দেয়া যাবে। কারুর সাধ্য নেই বুঝতে পারে। আমার এ অনুমান ভুল হয়নি। শাবলের চাড় দিয়ে ইটগুলোকে নামিয়ে নিলাম। তারপর বেশ সাবধানে লাশটাকে ভেতরের দেয়ালের মধ্যে রেখে দিয়ে আবার ইটগুলোকে আগের মতো সাজিয়ে দিলাম। সুরকি, বালি ইত্যাদি জোগাড় করলাম। কোনো বিষয়েই খুঁত রাখা হল না। পলস্তারা মেশাবার সময়ে যতদূর সম্ভব সাবধান হলাম। আমার বালির কাজ ঠিক আগেকারটির মতো হতে হবে। সমস্ত দেয়ালটার বালির কাজ যখন সুচারুরূপে শেষ করা গেল তখন দেয়ালটার আগাগোড়া দেখে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। এখন আর মনেই

হয় না দেয়ালটাকে কিছুক্ষণ আগে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। চুন-সুরকির বুয়োগুলো খুব সাবধানে খুঁটি খুঁটে তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। তারপর চারদিকে একবার বিজয়গর্বে তাকিয়ে নিয়ে নিজের মনেই বললাম। সত্যি, অন্তত এ ব্যাপারে আমার পরিশ্রম শেষপর্যন্ত সার্থক হয়েছে।

যে জন্তুটি এত কাণ্ডের মূল এবার তাকে খুঁজে বার করতে হবে। মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম ওই পাপটাকে এবার শেষ করব। সেইমুহুর্তে ওটাকে পেলে আর আস্ত রাখতাম না। কিন্তু বিড়ালটিও কম চালাক নয়। সে বোধহয় আমার মতলবটো আগেভাগেই টের পেয়েছিল। আমার কিছুক্ষণ আগেকার মূর্তি সে বোধহয় ভুলতে পারেনি। তাই বোধহয় কোথাও গিয়ে লুকিয়ে আছে। ভাবলাম ভালোই হয়েছে। তার এই অনুপস্থিতিতে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। এই মুক্তির আনন্দ যে কী তা বলে বোঝানো অসম্ভব। রাতে সে আর ফিরে এল না। তার এ বাড়িতে আসার দিন থেকে এই একটিমাত্র রাতে আমি নিশ্চিন্তে একটু ঘুমুতে পারলাম। গভীর নিদ্রা, অদ্ভুত আমেজপূর্ণ ঘুম। স্ত্রীকে হত্যা করার যে গ্রানি, সে গ্লানিকেও যেন এ আমেজ, পরিতৃপ্ত এ ঘুমের আবেশ ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। পরদিন এবং তারপরের দিনটাও কেটে গেল ভালোভাবেই। সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন আর ফিরে এল না। অনেকদিন পরে নিজেকে স্বাধীন মানুষ বলে মনে হতে লাগল। স্বস্তির নিশ্বাস নিলাম বুক ভরে। বিভীষণ বোধহয় একেবারেই দূর হয়েছে। আপদ গেছে। আর ওকে দেখতে হবে না। আমার এখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ। এ সুখের মধ্যে আমার কুকর্মের স্মৃতি কোনো বিকার ঘটাতে পারবে না। কেউ কেউ ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীর খোজ করেছিল, কিন্তু তাদের সবাইকে বেশ ছ্বরিত উত্তর দিয়ে নির্বিঘ্নে বিদায় করে দেয়া গেছে। এমনকি, একবার খানাতল্লাশও হয়েছিল। কিন্তু তারা আপত্তিকর কিছুই পায়নি। আমার ভবিষ্যৎ সুখ এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

হত্যাকাণ্ডের চারদিনের দিন একদল পুলিশ কর্মচারী আচমকা ঘরে এসে ঢুকলেন। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির চারদিকে খানাতল্লাশি করতে লাগলেন। লাশ লুকিয়ে রাখবার জায়গিটার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই আমি মোটেই উদ্বিগ্ন হইনি। পুলিশ কর্মচারীরা খানাতল্লাশির সময়ে আমাকে তঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বললেন। কোনোকিছুই দেখতে বাদ রাখলেন না তাঁরা। পরপর চারবার তারা আমাকে নিয়ে উঁড়ার-ঘরে গেলেন। বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইনি। বুকখানা এমনি নির্বিকারভাবেই স্পন্দিত হচ্ছিল যেন কিছুই জানিনে। উঁড়ারঘরে ঢুকে এ-ধার থেকে ও ধার পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়ালাম। বুকের উপর হাতদুটো ভাঁজ করে রেখে নির্বিকারভাবে ঘরের এ—মুড়ো থেকে ও—মুড়া পর্যন্ত পদচারণা করে বেড়াতে লাগলাম। খানাতল্লাশির পর পুলিশ কর্মচারীরা বেশ সন্তুষ্ট হয়েই চলে যাবার উপক্রম করলেন। ভেতরে ভেতরে আমার স্মৃতি তখন দেখে কে! নিজেকে সামলে রাখাই দায় হয়ে উঠল। আরো কিছু একটা বলে ওদের আরো একটু নিঃসন্দেহ করে দেবার জন্যে ভেতরে

ভেতরে আমি একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। এটুকু হলেই যেন আমার পুরো নিরপরাধ হওয়াটা আরো নিশ্চিত, আরো পাকাপাকি হয়ে যায়।

তারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। আমি তাঁদের সম্বোধন করে বললাম: “ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আপনাদের কুশল কামনা করি। তবে আশা করি এর পর আপনারা এই ধরনের ব্যাপারে আরো একটু ভদ্রতার পরিচয় দিতে যত্নবান হবেন। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই বাড়িটা গঠনকাজের দিক থেকে সত্যিই বেশ মজবুত।” (অবলীলাক্রমে কী বলতে গিয়ে আমি যে কী বলে ফেলেছি তা নিজেই বুঝতে পারিনি।) ‘হ্যাঁ সত্যি, বাড়িটা অত্যন্ত মজবুত, বিশেষ করে এই যে দেয়ালগুলো দেখছেন, বাস্তবিকই নিখুঁত গাঁথুনি এদের। কই মশাইরা, চলে যাচ্ছেন নাকি?’ অদ্ভুত এক বাহাদুরির ভাব যেন আমায় পেয়ে বসল। উন্মাদের মতোই আমি আমার হাতের ছড়িটা দিয়ে সদ্য-গাথা দেয়ালটায় (যার মধ্যে আমার স্ত্রীর লাশ গাঁথা রয়েছে) বেশ জোরে কয়েকটা খুতো মারলাম।

কিন্তু হা খোদা! শয়তানের কোপ কটাক্ষ থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও! আমার ছড়ির আঘাতের শব্দের রেশ বাতাসে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই, দেয়ালের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল। প্রথমটা গোঙানির মতো চাপা একটা স্বর, ছোটছেলের ফুঁপিয়ে কাঁদার মতো অনেকটা। পরীক্ষণেই শব্দটা হঠাৎ বেশ একটু চড়া হয়ে উঠল, তারপরেই শুরু হল একটানা অমানুষিক দুর্বোধ্য একটা শব্দ। ক্রমে সে চিৎকার যন্ত্রণাকাতর বীভৎস এক আর্তনাদে পরিণত হল। কী ভয়ঙ্কর, কী নিদারুণ সে আর্তনাদ, যেন নরকের মধ্যে থেকে শতসহস্র দানবের কাতর পিশাচের রক্তহিম করা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ যেন বাতাসে বাতাসে কেঁপে কেঁপে ফিরছে।

নিজের কথা আর কিছু বলতে যাওয়া বোকামি। প্রায় মুর্ছিত অবস্থায় আমি বিপরীত দিকের দেয়ালে চলে পড়লাম। এক মুহূর্তের জন্যে পুলিশরা স্তম্ভিত হয়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন। এই বীভৎস ব্যাপারে তারা ভীষণ আতঙ্কিত। কিছুক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই পাঁচ-ছ'জন পুলিশ কর্মচারী ক্ষিপ্ৰগতিতে দেয়ালটা ভাঙতে শুরু করে দিলেন। দেয়ালটি একেবারে সবটুকুই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। আমার স্ত্রীর মৃতদেহটা সমুখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে! চাপচাপ রক্তের ডেলা আর পচা মাংসের সে এক বীভৎস দৃশ্য। আর তখনই দেখা গেল লাশটার মাথার উপর বসে আছে ভীষণ মূর্তিমান বিভীষিকা যেন, সেই কালো বিড়ালটা। লালমুখ হাঁ করে আছে। একটিমাত্র চোখ থেকে যেন তার প্রতিহিংসার তীব্র আগুন ফুটে বেরুচ্ছে।

দুর্ভাগ্য আমার! এই শয়তানের কারসাজিই শেষপর্যন্ত আমাকে খুন করতে বাধ্য করেছিল, আর তার শয়তানই আজ আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করল। আমি বুঝতেও পারিনি দেয়াল গাঁথবার সময়ে কখন আমি নিজের অজান্তেই এ—পিশাচকেও ভেতরে রেখেই দেয়ালটা গেঁথে ফেলেছিলাম!

শব্দ

হ্যাঁ, স্নায়বিকভাবে কিছুটা দুর্বল ছিলাম আমি— এখনো সে দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাই বলে আপনি আমাকে পাগল ভাবতে পারে না। সেই দুর্বলতা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ বলে আপনি আমাকে পাগল ভাববেন না! সেই দুর্বলতা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ, সজাগ করেছে, ভোঁতা করেনি। আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় এখন সবচেয়ে সজাগ। স্বর্গ-মর্তের সমস্ত স্বর, সমস্ত ধ্বনি, আমি যেন শুনতে পাই। এমনকি নরকেরও। তাহলে কী করে আমাকে আপনি পাগল বলেন? পাগলেরা কি আমার মতো এমন গুছিয়ে গলপ বলতে পারে?

আমি ঠিক বলতে পারব না, কী করে কথাটা আমার মাথায় এল। কিন্তু একবার মনে হবার পর থেকেই ভাবনাটা দিনরাত আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, অন্য কোনো তাড়নাতেও নয়, আমি প্রায় অযথাই সেই বুড়োলোকটাকে ভালোবাসতাম। সে কোনোদিন আমার কোনো ক্ষতি করেনি। আমাকে উপহাস করেনি। তার টাকা পয়সার ওপরেও আমার বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। আমার মনে হয় তার চোখজোড়াই এই চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেবার মূল কারণ। হ্যাঁ তাই। ওর চোখজোড়া ছিল শকুনের মতো তীক্ষ্ণ, নীলাভ, স্বচ্ছ পর্দার আবরণে ঢাকা। যখন সে আমার দিকে তাকাত, রক্ত আমার হিম হয়ে আসত আতঙ্কে স্থির করলাম। ওকে আমি হত্যা করব। ওর ওই চোখ আমি চিরদিনের মতো বুজিয়ে দেব।

এখনো হয়তো আপনি আমাকে পাগল মনে করছেন। কিন্তু পাগল তো কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ না বুঝেই কাজ করে। ভালো করে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন। কতখানি চিন্তা করে, কত সাবধানে এবং সন্তপর্মে, পরিণতি ভেবেই আমি এই কাজে অগ্রসর হয়েছি। প্রত্যেক রাতে, রোত যখন গভীর, আমি তার দরজার খিল খুলেছি কত সাবধানে। তারপর দরজায় মাথা গলাবার মতো ফাক করে আমার ঢাকা-দেওয়া লঠনটা এগিয়ে দিয়েছি প্রথমে। এমনভাবে আলোটা ঢেকে নিয়েছি। যাতে কেউ দেখতে না পায়। তারপর মাথা গলিয়ে দিয়েছি। আপনি হয়তো আমার চতুরতার কথা শুনে হাসছেন। কিন্তু মাথাটা গলিয়েছি সত্যিই এমনভাবে যাতে বুড়োলোকটার ঘুম কোনোক্রমেই না ভাঙে। শুধু মাথাটা গলাতেই আমার এক ঘণ্টা লেগেছে। বলুন, কোনো পাগল কি এত ধীরেসুস্থে ভেবে কাজ করতে পারে? তারপর যখন আমার সবটা মাথা ভেতরে গলে গিয়েছে তখন খুব সাবধানে, আরো সাবধানে (দরজায় শব্দ উঠেছিল কাঁচ করে, তাই) বাতির একদিকের ঢাকনাটা অল্প একটুখানি তুলে ধরেছি। খুব সামান্য, যাতে করে সুতোর মতো একফালি আলো গিয়ে পড়তে পারে তার শকুনের মতো চোখদুটোর ওপর। ঠিক এমনি করে সাত রাত, প্রতিবারই মাঝরাতে আমি আলো

ফেলেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় ওর কক্ষ সাত রোতই বন্ধ দেখেছি। তাই সেই কাজটা শেষও আমি করতে পারিনি। ওর ওপর আমার কোনো আক্রোশ ছিল না, ওর শয়তানি চোখজোড়াই ছিল আমার শত্রু। আর প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যেতাম তার ঘরের দিকে। অন্তরঙ্গ সুরে তার নাম ধরে ডেকে শুধোতাম, কাল রোত তার কেমন গেছে। কাজেই বুঝতে পারছেন তার পক্ষে অনুমান করা কতখানি শক্ত যে, প্রতি রাতে বারোটোর সময় আমি তার ঘরে যাই।

অষ্টম রাতে আমি অন্যদিনের চেয়ে একটু সাবধানে দরজাটা খুললাম। সবকিছু এত আশ্বে করছিলাম যে, ঘড়ির মিনিটের কাটাও সে তুলনায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এর আগে, আমি এতখানি বিচক্ষণতার পরিচয় আর দিইনি। ভাবতে বেশ লাগছিল যে, বেচারি গাঢ় ঘুমে বিভোর হয়ে আমার অভিসন্ধি এতটুকুও টের পাচ্ছে না। হঠাৎ থামলাম। ও কি শুনতে পেয়েছে নাকি? তা না হলে আমন করে, যেন কিছু শনেছে এমনভাবে বিছানায় হঠাৎ ও নড়ে উঠল কেন? আপনি হয়তো মনে করছেন, আমি তখন তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়েছিলাম? না তার ঘরে তখন গাঢ় অন্ধকার। এত গাঢ় যে চোখে কিছুই ঠাহর হওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর চোরের ভয়ে জানালা সব বন্ধ ছিল। আমি জানি ও আমাকে দেখতে পাবে না। এই অন্ধকারে তাই আমি আশ্বে আশ্বে দরজার পাল্লা সরাতে শুরু করলাম আবার।

মাথা গলিয়ে আমি লঠনের ঢাকনা খুলতে যাচ্ছি এমন সময় হাত ফসকে গিয়ে মৃদু। শব্দ উঠল। আর সাথে সাথে বিছানার উপর লাফ দিয়ে বসে বুড়োটা চিৎকার করে উঠল কে ও?

আমি উত্তরে কিছুই বলিনি। কেবল এক ঘণ্টা ধরে এমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছি নিঃশব্দে। আর সে-ও এক ঘণ্টার ভেতরে শোয়নি। ঠায় বসে থেকে কান খাড়া করে শব্দটা আবার শুনবার চেষ্টা করেছে।

এমন সময়ে হঠাৎ মৃদু কাতরানির শব্দ শুনতে পেলাম। কোনো ব্যথা কিংবা দুঃখের জন্য নয়, আতঙ্কিত হয়ে সে কঁকিয়ে উঠল বুকুর গভীর থেকে। এ স্বর আমার পরিচিত। রাত যখন গভীর হত আর পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন ঠিক এমনি স্বর আমি শুনেছি আমার বুকুর ভেতরে। আমি সব জানি। একটু যেন করুণা হল বুড়োটার জন্যে। বুঝতে পেরেছিলাম বিছানায় নড়বার পর থেকে এখন অবধি সে কান খাড়া করে জেগে বসে আছে। ভয়ে তার মন কুঁকড়ে এসেছে। চেষ্টা করছে এসব কল্পনাপ্রসূত বলে দূরে সরিয়ে দিতে, কিন্তু পারছে না। নিজে নিজেই বলছে, “হয়তো চিমনিতে বাতাস এসে ধাক্কা দিয়ে থাকবে কিংবা একটা হুঁদুর হেঁটে গেছে মেঝে দিয়ে। কিংবা হয়তো ঝাঁঝি পোকাই ডেকে উঠে থাকবে।” এইসব যুক্তি খাড়া করে নিজেকে সাহস দিতে চাইছে সে, বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু বৃথা তার চেষ্টা। সম্পূর্ণ বৃথা। কেননা, মৃত্যু এসে এখন দাঁড়িয়েছে তার সামনে। এখন এসবের কী অর্থ? তার কালো ছায়া তাকে গ্রাস

করে ফেলেছে। যদিও সে কিছুই শোনেনি, বা দেখেনি, তবু এই অস্বাভাবিক মোহাবস্থা তাকে উৎকর্ষ করে রাখল। সে অনুভব করতে পারল যে, কিছু একটা তার সামনে তখন দাঁড়িয়ে।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার পর যখন দেখলাম ও তবু শুয়ে পড়ছে না, তখন ভাবলাম আলোর ঢাকনাটা সামান্য একটু খুলব। আপনি ভাবতে পারবেন না। কত সাবধানে, কত নিঃশব্দে, কী কষ্টে, আমি ঢাকনাটা চুল পরিমাণ ফাক করলাম। আর তার পরেই মাকড়সার জলের মতো একফালি সূক্ষ্ম আলো গিয়ে পড়ল ওর শকুনের মতো চোখের উপর।

সে চোখ প্রশস্ত, খোলা। সেদিকে তাকিয়ে আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই বীভৎস চোখদুটো। খোলা নীল একটা বীভৎস পরদায় ঢাকা। সমস্ত শরীর আমার কেঁপে উঠল। আমি তার মুখের কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কেননা সে আলো শুধু গিয়ে পড়েছিল তার চোখের উপর।

আমি তো আগেই বলেছি আপনারা যাকে আমার উন্মাদের লক্ষণ মনে করছেন তা আমার ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম, অতি তীক্ষ্ণ সজাগতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময়ে আমি একটা নিচু অথচ দ্রুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঘড়িকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখলে যেমন শব্দ ওঠে, ঠিক তেমনি। এ-ও আমার অতি চেনা। বুড়োলোকটার হৃৎপিণ্ডের শব্দ এটা। যেমন ঢাকের শব্দ সৈনিককে সাহসী করে, ঠিক তেমনি আমি ওই শব্দে যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম।

তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃশব্দে। নিশ্বাস ফেলছি না। বাতিটা একইভাবে ধরে রাখলাম, যাতে আলোটা তার চোখের উপর থেকে কোনোক্রমে সরে না যায়। এমন সময় হৃৎপিণ্ড তার আরো দ্রুত টিপটিপ শব্দ করে উঠল। প্রতি মুহূর্তে তা দ্রুত থেকে দ্রুততর এবং স্পষ্ট হতে লাগল। নিশ্চয়ই বুড়োটা খুব ভয় পেয়েছে। আরো দ্রুত, হ্যাঁ প্রতি মুহূর্তে আরো দ্রুত হচ্ছে সেই শব্দ। ভালো করে লক্ষ করুন আমার কথা। আমি আগেই বলেছি আমার স্নায়বিক দুর্বলতা আছে। এই গভীর রাত্রিতে তা যেন আরো ভালো করে বুঝলাম। পুরনো এই বাড়ির স্তব্ধতায় এই দুরন্ত শব্দ আমাকে ভীত আতঙ্কিত করে তুলল। তবু কয়েক মুহূর্ত আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু হৃৎপিণ্ড তার আরো, আরো দ্রুত চলছে। বোধহয় এখনি ফেটে যাবে। ভয় হল, আশপাশের সবাই তার বুকের এই টিপটিপ শব্দ হয়তো শুনে ফেলছে। তাই সহসা বাতিটা পুরোপুরি খুলে চিৎকার করে ঘরের ভেতরে লাফিয়ে পড়লাম। একবার সে আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু মাত্র একবারই। পরমুহূর্তেই আমি তাকে টেনে মেঝেতে ফেলে বুকের উপর তার ভারি বিছানাটা চেপে ধরলাম। যাক এ পর্যন্ত কাজটা করতে পেরেছি ভেবে একবার হেসে নিলাম। তারপরও কয়েক মিনিট ধরে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। দেয়ালের ও পাশ থেকে কেউ শুনতে পায় না। আস্তে আস্তে শব্দটা থেমে গেল। বুড়োলোকটা মরে গেছে। বিছানা সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম

আমি। পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে তার দেহ। তার বুকের উপর অনেকক্ষণ ধরে হাত রাখলাম। না, চলছে না। তার চোখ আর আমাকে তাড়া করবে না।

যদি এখনো আমাকে পাগল মনে করেন, তাহলে এবার কী বুদ্ধি করে মৃতদেহটা সরিয়েছি, শুনলে আর তা মনে করবেন না। সারারাত অদ্ভুত ক্ষিপ্ততার সাথে কাজটা করেছি। প্রথমে টুকরো টুকরো করে কেটেছি। দেহটা, দুটো হাত আর পা। তারপর মেঝের পাটাতন থেকে তিনটে তক্তা তুলে তার নিচে লুকিয়ে ফেলেছি টুকরোগুলোকে। তারপর এত সাবধানে জোড়া মিলিয়ে তক্তাগুলো আবার পেতেছি যে, কেউ, এমনকি বুড়োটার চোখও যেন কিছুই সন্দেহ করতে না পারে। কোনো রক্ত পড়েনি, কিছু ধুতে হবে না আমাকে। সেদিকে আমি বরাবরই সতর্ক ছিলাম। পানির একটা বড় পাত্রই যথেষ্ট ছিল তার পক্ষে। হাঃ হাঃ হাঃ! যখন সব কাজ শেষ হল। তখন রাত চারটি। বাইরে তখনো গভীর রাত্রির মতো অন্ধকার। ঘড়িতে চং চেং করে ঘণ্টা পড়বার সাথে সাথে আমি রাস্তার দরজায় টোকা পড়বার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি স্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে এলাম। কিসের জন্যে আমি ভয় করতে যাব? তিনজন লোক ঢুকল। মিষ্টি সুরে পরিচয় দিল তারা পুলিশের লোক বলে। প্রতিবেশীরা নাকি রাত্রে একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে সন্দেহক্রমে পুলিশে খবর দিয়েছে। আর তাই ওরা এসেছে বাড়িটা খানাতল্লাশি করে দেখতে।

আমি হাসলাম। হাসব না কেন? কেন, ভয় কিসের? তাদের সাদরে ভেতরে নিয়ে এলাম। বললাম, স্বপ্নের ঘোরে। আমিই চিৎকার করে উঠেছিলাম মোঝরাতে। আর বুড়োলোকটা বর্তমানে এখানে নেই। বাইরে গ্রামে বেড়াতে গেছে। তবে যদি তল্লাশি করতে চান করুন।

ভেতরে সবখানে নিয়ে গেলাম তাদের। অবশেষে সবাই এসে ঢুকলাম বুড়োর কামরায়। দেখলাম তার জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে। কিছুই নড়াচড়া হয়নি। তাদের আরো বিশ্বাস করাবার জন্যে এ ঘরেই চেয়ার এনে বললাম কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে। আর আমি নিজে একটা চেয়ার টেনে নিলাম মেঝের ঠিক সেই জায়গায় যার নিচে ওর মৃতদেহটা রয়েছে।

পুলিশের লোক সব দেখে সন্তুষ্ট। আমার আচরণ তারা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে। আমি আরাম করে চেয়ারে সহজ ভঙ্গিতে বসে ছিলাম। আলোচনা করছিলাম ছোটখাটো অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে।

হঠাৎ আমার রক্ত হিম হয়ে এল। ইচ্ছে হল ওদের চলে যেতে বলি। মাথাটা যেন কেমন ঘুরছে। কানে বিচিত্র শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তবুও ওরা বসে। তবুও ওরা কথা বলছে। অবশেষে শব্দটা স্পষ্ট হয়ে এল। ক্রমে আরো স্পষ্ট হল। আমি সহজ হবার জন্যে তাদের সাথে বেশি করে কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু না, শব্দটা বেড়েই চলেছে। অবশেষে বুঝতে পারলাম আমার কানের ভেতর নয়, অন্য কোনোখান থেকে এর উৎপত্তি।

সন্দেহ নেই আমার মুখ তখন সাদা হয়ে গিয়েছিল। শব্দটা কেবলি বাড়ছে। আমি উঁচু গলায় দ্রুত কথা বলে চলেছি। কিন্তু কী করব? একটা চাপা অথচ দ্রুত শব্দ যে বেড়েই চলেছে। ঘড়িকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখলে যেমন শব্দ ওঠে, ঠিক তেমনি। জোরে নিশ্বাস টানলাম, ওরা তা শুনতে পেল না। আরো দ্রুত কথা বলতে লাগলাম। কথার তোড়ে সবকিছুই ভাসিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু শব্দটা বেড়েই চলেছে। কিন্তু কেন ওরা চলে যাচ্ছে না? আমি মেঝের উপর উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলাম। তবুও শব্দটা শোনা যাচ্ছে। কী করব! আমার মাথায় আগুন ধরে এল। দাত চেপে এল ক্রোধে। আমি চেয়ারটাকে টানাটানি করলাম কয়েকবার মেঝেয় বিপ্রী শব্দ করে। তবুও সেই শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, বাড়ছে সেই শব্দটা! আরো, আরো স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু ওরা তেমনি গল্প করছে, হাসছে। তাহলে ওরা কি কিছুই শুনতে পায়নি? না, না, তা হতে পারে না। ওরা শুনেছে। ওরা সন্দেহ করেছে। ওরা জানতে পেরেছে। ওরা আমার ভীত অবস্থা দেখে হাসছে, উপহাস করছে। অন্তত আমার তাই মনে হল। কিন্তু এই দমবন্ধ অবস্থা তো আর সহ্য হয় না। এই হাসির চেয়ে অন্য যে কোনো কিছু ভালো বলে মনে হল। আমি চিৎকার করে উঠব কিংবা মরে যাব এখুনি। আবার, আবার, সেই শব্দ— আবার দ্রুত, দ্রুততর। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে।

চিৎকার করে উঠলাম— ‘শয়তানের দল আর ভান করবার দরকার নেই। হ্যাঁ আমি। আমিই খুন করেছি। মেঝের তক্তা তুলে দেখ। এই যে, এখানে, এখানে। এ শব্দ ওর, ওরই হৃৎপিণ্ডের।

মোরেলা

বান্ধবী মোরেলাকে আমি এককভাবে স্নেহ করতাম। গভীরভাবে ভালোও বাসতাম তাকে। অনেকদিন আগে হঠাৎ দেখা হয়েছিল ওর সাথে। সেই প্রথম দেখার পর থেকে আমার হৃদয় ওর জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। কিন্তু সেই ব্যাকুলতার আগুন ভালোবাসার আগুন নয়। অনেকদিন ধরে সেই উত্তাপ অনুভব করেছি আমি। কেন যে এমনটি হয়, এ যে কী তা আমি জানি না। তাকে আমি ইচ্ছেমতো থামাতেও পারিনি। তবু আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। একসাথে আমাদের ভাগ্য বাধা পড়ে গেছে বিবাহের পবিত্র বেদিতে। আমি আবেগ প্রকাশ করিনি, ভালোবাসার কথা ভাবিনি। মোরেলা তার বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু আমাকে নিয়ে থাকতে শুরু করল। আমি এতে খুশি হয়েছিলাম খুব। এ খুশি স্বপ্নের মতো।

মোরেলার যথেষ্ট লেখাপড়া ছিল। আমার বিশ্বাস তার মেধা অসাধারণ, মনোবল অদ্ভুত। আমি এটা অনুভবও করেছিলাম। অনেক ব্যাপারে তার শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছি। যা হোক শিগগিরই লক্ষ করলাম যে, কিছু অলৌকিক লেখা নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। বুঝতে পারি না কেন ওই লেখাগুলোর ওপর ওর এত পক্ষপাতিত্ব। সারাদিন ওই নিয়ে মেতে থাকে সে। ক্রমে ক্রমে সেগুলো আমারও প্রিয় হয়ে উঠল। মোরেলার সাহচর্যে।

যদি ভুল না হয় তাহলে বলতে পারি, কোনো কারণ ছাড়াই আমার এই প্রীতি গড়ে উঠেছিল। তার প্রিয় বইগুলোর ভেতরে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি নিজেকে। যখন সেই নিষিদ্ধ অনুভূতি আমার ভেতর বিস্তৃত হয়ে পড়ত, তখন মোরেলা এসে তার ঠাণ্ডা হাত আমার হাতে রেখে আমার ঘোর কাটিয়ে দিত। সেই শুষ্ক, মৃত দর্শনশাস্ত্রের ভেতর থেকে শুনতে পেতাম তার কণ্ঠস্বর— একটা-দুটা শব্দ। তার অর্থ আমার স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে যেত। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা তার পাশে বসে তার সংগীতময় কণ্ঠস্বরের কথা ভাবতাম। অবশেষে সেই সংগীত এক ভয়াবহ আতঙ্কের রূপ ধারণ করত। আত্মা আমার অন্ধকার হয়ে যেত। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আসত। সেই অবাস্তব, অনৈসর্গিক কণ্ঠস্বরের সমুখে ভয়ে আমি কাঁপতাম। এমনি করেই সুখ হয়ে যেত ভয়, সুর হয়ে যেত অসুর, এক মুহূর্তেই।

মোরেলা এবং আমাতে ওই বইগুলো নিয়ে যে ধরনের যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা হত তা এখানে বলা নিম্প্রয়োজন। তবে একটা কথা এখানে শুধু বলব। আমাদের সকলেরই একটা নিজস্ব সত্তা আছে। আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন। এই যে ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য তা মৃত্যুর পরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা না-ও পারে। এই ব্যাপারটা ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়। মোরেলা যখন এ নিয়ে আলোচনা করত তখন সে উত্তেজিত হয়ে উঠত অস্বাভাবিক রকমে।

এমনি করে একদিন এমন মুহূর্ত এল যখন আমার স্ত্রীর এই রহস্যময় ব্যবহার আমাকে অভিভূত করে ফেলল। তার কৃশ শরীর, সংগীতময় ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, তার বিষন্ন চোখের আভা, কিছুই আর সহ্য করতে পারলাম না। সে আমার এই ব্যাপারটা জানত, কিন্তু কোনো কথা বলত না। আমার দুর্বলতা বা বোকামি যাই হোক-না কেন, দেখে সে হাসত। বলত, এ সবই ভাগ্য। দিনে দিনে মোরেলা মান হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে রক্তিম গণ্ড একদিন পাণ্ডুর হয়ে এল। নীল শিরাগুলো ফুলে উঠল সেখানে। আমার মন দুঃখে ভরে যেত সেদিকে তাকিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি পড়ত আমার চোখে। আত্মা আমার সহসা যেন ভরে উঠত শূন্যতায়।

তাহলে কি বলতে হবে। আমি তার এই ক্রমাগত বিলীন হয়ে যাওয়া মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম? হ্যাঁ করেছিলাম। বৈ কি! কিন্তু এত দেরিতে তা হচ্ছিল যে, একদিন আমার জেদ বেড়ে গেল। উন্মত্ত হয়ে গেলাম। অযথা বিলম্ব দেখে। তার জীবন বিলীন হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, এমনকি দীর্ঘতম হয়ে এসেছিল। আমি অভিশাপ দিতে লাগলাম অলস মন্ত্র সময়কে।

কিন্তু একদিন এক শরৎ-সন্ধ্যায় মোরেলা তার বিছানার পাশে আমাকে ডাকল। বাতাস তখন স্থির। পৃথিবীতে একটা পাতলা কুয়াশার চাদর বুলছে। জলাভূমির উপর উঠেছে। উষ্ণ একটা দীপ্তি। আর বনভূমির অন্ধকারে এসে ঠেকেছে একটা রামধনু। আমি কাছে গেলে ও বলল, আজকের দিনটা সবচেয়ে সেরা দিন। বাঁচবার নয়তো মরবার মতো একটা দিন আজ। পৃথিবীর পুত্র এবং জীবনের দিন আজকে। হয়তো স্বর্গের কন্যা এবং মৃত্যুর দিনও আজকে।

মোরেলার মাথায় চুমু খেলাম। সে বলে চলল, “আমি মরে যাচ্ছি, তবু আমি বাঁচব।

মোরোলা!

আজও হয়তো আমাকে ভালোবাসনি তুমি, কিন্তু জীবনে যাকে ঘৃণা করেছ, মরণে তাকে প্রার্থনা করবে।

মোরোলা।

হ্যাঁ আমি মরে যাচ্ছি। আমার ভেতরে রয়েছে সেই স্নেহবীজ— সেই ছোট্ট মোরেলাকে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাকে ভালোবেসে। যখন আমার প্রাণ চলে যাবে তখন যে শিশু বাঁচবে- সে হবে তোমার এবং মোরেলার সন্তান। কিন্তু সেই দিন হবে দুঃখের দিন, যেমন সাইপ্রাস দীর্ঘদিন ধরে বাঁচে, তেমনি এ দুঃখ হবে দীর্ঘস্থায়ী। কেননা তোমার সুখের দিন বিগত প্রায়। গোলাপ হয়তো বছরে দুবার ফোটে। কিন্তু জীবনে সুখের দিন দুবার আসে না।

চিৎকার করে উঠলাম, মোরেলা, মোরেলা, তুমি কী করে তা জানলে? কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিল বালিশের ওপাশে। একটা মৃদু কম্পন জাগল তার শরীরে। সে মারা গেল।

তার উক্তি অনুযায়ী সেই শিশু, যে কিনা তার মরবার মুহূর্তে জন্মেছিল এবং তার মরবার পর নিশ্বাস নিয়েছে, সে বেঁচে গেল। দিনে দিনে সে শারীরিক মানসিক দুদিক দিয়েই বেড়ে উঠতে লাগল। দেখতে হল ঠিক অবিকল মোরেলারই মতো। আমি মেয়েটাকে এত ভালোবাসতে লাগলাম যে, পৃথিবীর আর কোনোকিছুকে অতটা ভালোবাসা সম্ভব নয়।

কিন্তু অল্পদিনের ভেতরেই সেই ভালোবাসার ওপর ব্যথা, ভয়, বিষন্নতা এসে ছায়া ফেলল। আগেই বলেছি শারীরিক মানসিক সব দিক দিয়েই ও বেড়ে উঠছিল। শরীর তার বাড়ছিল দ্রুত। কিন্তু সবচেয়ে বিহ্বল করে দিল তার মানসিক সত্তার দ্রুত পরিবর্তন এবং গঠন। তার কিশোরী শরীরে বয়স্ক মহিলার ক্ষমতা আর চিহ্ন দেখতে লাগলাম। তার কিশোরী ঠোঁটে অভিজ্ঞা নারীর অভিজ্ঞতা উচ্চারিত হতে লাগল। এর কি আর কোনো মানে হতে পারে? যখন এই ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার চোখে, যখন আমি আর তা সহ্য করতে পারলাম না, অথচ কাউকে বলতেও পারলাম না; তখন ধীরে ধীরে মনে পড়ল কবরে শায়িতা মোরেলার অদ্ভুত কাহিনী আর রোমাঞ্চকর দর্শনের কথা।

বছরের পর বছর গড়িয়ে যেতে লাগল। তার ক্রমবর্ধমান শরীরের দিকে তাকিয়ে উদঘাটন করতে লাগলাম মাতা ও কন্যার গভীর সাদৃশ্য। সেই একই বিষন্নতা ও মৃত্যুর ছায়া। এই সাদৃশ্য গভীর হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। সেই পরিপূর্ণ, নিশ্চিত, বিহ্বলকারী, বীভৎস সাদৃশ্য। তার চোখ, তার হাসি, সবই মোরেলারই মতো। তেমনি পাণ্ডুর মূর্তি, নিচু সংগীতময় স্বর। তেমনি প্রশস্ত কপাল আর রেশমি অলকগুচ্ছ। সবচেয়ে ভয়াবহ মোরেলার মতো আগ্রহ এবং দৃষ্টি দিয়ে সে-ও তাকাত আমার দিকে। এমনকি তার কথাবার্তা হুবহু মোরেলার মতো, যেন মোরেলার কথাই শোনা যাচ্ছে ওর মুখ থেকে।

এমনি করে তার জীবনের দুটি অধ্যায় চলে গেল। আমার কন্যার এখনো কোনো নাম রাখা হয়নি। বাইরের কারুর সাথে কখনো সে মিশত না। আমি তাকে ‘বাছা’ ‘সোনামণি’ এমনি সব আদরের সম্বোধন করে ডাকতাম। মোরেলার নাম তার মরবার সাথে সাথেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মায়ের সম্বন্ধে মেয়েকে কোনোদিন কোনো কথা বলিনি। বলা অসম্ভব। একদিন আমার মনে হল তাকে এবার ব্যাপটাইজ করানো দরকার। একটা উপযুক্ত নামের জন্যে এবার ইতস্তত করতে লাগলাম। পুরনো, নতুন, প্রচলিত, দেশি, বিদেশি, বহু নাম আমার মনে পড়তে লাগল। সহসা মৃতের কথা মনে পড়ল। ফিসফিস করে উচ্চারণ করলাম পুরোহিতের কানের কাছে: মোরেলা। সাথে সাথে আমার কন্যার মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তার স্বচ্ছ চোখ মাটি থেকে আকাশের দিকে নিবদ্ধ হল। তারপর পুরনো হলটার কালো পাথরের উপর ও চলে পড়ে গেল। প্রতিধ্বনিত হল: এই তো আমি এখানে।

অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম শব্দকটি। সে শব্দ আমার কানের ভেতর ঢুকে গরম সিসার মতো মগজে গড়িয়ে পড়ল যেন। বছর গড়িয়ে যেতে পারে,

কিন্তু স্মৃতি হারিয়ে যায় না কোনোদিন। চারদিকে আমি শুধু দেখতে লাগলাম মোরেলাকে। বাতাসে, আকাশে, সমুদ্রের ঢেউয়ে উচ্চারিত হতে লাগল মোরেলার নাম। কিন্তু সে তো বেঁচে নেই! আমি তাকে নিজের হাতে কবর দিয়েছি। হো হো করে হেসে উঠলাম। তিঁজু সে হাসি, কেননা তার মুখে প্রথমার আর কোনো মিল নেই। দ্বিতীয় মোরেলাকে যেখানে কবর দেয়া হল সেই কবরের প্রকোষ্ঠে হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল।

চোরাই চিঠি

১৮— সালের শরৎকালের একটি সন্ধ্যা। বন্ধু আগস্ত দুপৌর বাসার ছোট্ট লাইব্রেরি। লাইব্রেরি-ঘরটার অবস্থান বাসার পেছনের দিকে। ঠিকানা: ৩৩ নম্বর রু'দুনো ফুবার্গ, সাঁ জারমেন, প্যারি। বাইরে আঁধার। হুহু করে এলোমেলো বাতাস বইছে। কল্পনা—বিলাস আর বন্ধুর এই সান্নিধ্য তখন পরম আরামের মনে হচ্ছিল। তার ওপরে ধূমপানের পরম তৃপ্তি। ঘন্টাখানেক বোধহয় দুজনেই চুপচাপ। এ সময়ে এবং এভাবে আমাদের কেউ দেখলে ভাববে আমাদের এখনকার যা কিছু আনন্দ সে সবই বুঝি এই নিরবচ্ছিন্ন ধূমপানকে কেন্দ্র করেই। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ছোট্ট ঘরটাকে যেন দম বন্ধ করে রেখেছে। সন্ধ্যার আগে দুপৌর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এখন আমি সেই বিষয়েই চিন্তা করছি। তাই এই বাহ্যিক নিস্তব্ধতা। সে কথাবার্তার বিষয়বস্তু ছিল রু'মর্গের সে বিভীষিকা আর তার পরপরই মেরি রুজেটের রহস্যময় মৃত্যু। ভাবছিলাম এ দুটো ঘটনা পরস্পর একই সূত্রে গাঁথা না হয়ে আকস্মিক ঘটনাপরস্পরাও হতে পারে। এমনি সময়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন আমাদের পরিচিত প্যারি পুলিশবাহিনীর কর্তা মঁসিয়ে জি— ।

আগন্তুককে আমরা উভয়েই সাদর সম্ভাষণ জানালাম। এ সম্ভাষণের কারণ আর কিছুই নয়, লোকটির চরিত্র এবং হাবভাব অনেকটা বিরক্তিকর হলেও তার মধ্যে একটা আনন্দমধুর ব্যাপারও আছে। তাছাড়া তাঁর সাথে অনেককাল পরে দেখা। অন্ধকার ঘরেই আমরা বসে ছিলাম। দুপৌ উঠল আলোটা জ্বলিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু মঁসিয়ে জি মুখ খুলতেই সে আলো না জ্বলিয়ে আবার বসে পড়ল। জি বললেন, একটা জটিল সরকারি ব্যাপারে তিনি আমাদের সাথে আলাপ করতে এসেছেন। আমার বন্ধুর মতামতটা এ বিষয়ে কী হতে পারে সেটুকু জানার জন্যেই নাকি তার শুভাগমন। দুপৌর আলোটা না জ্বালবার কারণটা এখন বুঝলাম। বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে ও সম্পূর্ণ বশীভূত এক পরিবেশের মধ্যে আনতে গেলে গভীর নিস্তব্ধতার সাথে সাথে অন্ধকারের রহস্যময় নীরবতাও দরকার।

পুলিশের কর্তা বিরক্তির সুরে বললেন, এটা তোমার আর একটা বদখেয়াল। তাঁর এ কথা বলার কারণ, নিজের ধ্যানধারণা ও বুদ্ধির বাইরে যা কিছু তিনি দেখেন বা শোনেন সবই তার কাছে বদখেয়াল বা উদ্ভট মনে হয়। এতে করে ফল হয়েছিল এই যে, তাঁর নিজের বাইরে তিনি সমগ্র জগৎটাকেই একটা উদ্ভট জিনিস ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারতেন না।

একটা বেশ আরামদায়ক চেয়ার আর তামাকের একটা পাইপ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দুপৌ বলল, ঠিকই বলেছ। প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপারটা কী? আবার খুনখারাবি নয় তো?' “না, না, তার ধারে কাছেও না। এটা হল একেবারে পানির

মতো সোজা। বলাবাহুল্য, আমরা নিজেরাই এর একটা হেস্টনেস্ট খুব সহজেই করে ফেলবার ক্ষমতা রাখি। তবে কী জানো, ভাবলাম দুপৌর হয়তো ঘটনাটুকু শুনতে বেশ ভালোই লাগবে। কারণ আসলে ব্যাপারটা একটু উদ্ভট। আর দুপৌ তো এসব উদ্ভট জিনিসেই বেশি পোক্ত।

দুপৌ বলল, “তাই নাকি? ব্যাপারটা পানির মতো সোজা আবার উদ্ভটও?”

“যা বলেছ ভায়া। তবে কী জানো এটা তেমন শক্ত একটা কিছু নয়। আসলে আমার মনে হয় এটা খুব সহজ আর তুচ্ছ বলেই বোধহয় আমাদের আপাতদৃষ্টি এড়িয়ে পিছলে। বেড়াচ্ছে, ধরতেও পারছিনে, এই যা।”

বন্ধু উত্তর দিল, “হয়তো আন্দৌ ধরবারই কিছু নেই, হয়তো বেশি সহজ বলেই একটু শক্ত বলে মনে হচ্ছে।”

“এই নাও; আবার সেই বাজে বকতে শুরু করলে।” মঁসিয়ে জি নিজের কথায় নিজেই হো হো করে হাসতে লাগলেন।

দুপৌ বলল, “না না কথাটা বাজে নয়, আমার মনে হয় রহস্যটা বোধহয় একটু বেশিরকমে সোজা। তাই এত ঘোরালো মনে হয়ে থাকবে।”

“বোঝে মজা এবার। তোমার এ ধরনের প্যাঁচালো উদ্ভট যত সব কথার কি কোনো মানে হয়?”

“না, না, প্যাঁচালো মোটেই না, তোমার রহস্যটা খুব সম্ভব একটু বেশিরকমের খোলাখুলি।”

দুপৌর কথাগুলো জি-র কাছে খুব বেশি ঘোরালো ও অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে। হা হা করে হাসির বেগ সামলাতে সামলাতে তিনি বললেন, “নাহ, তুমি দেখছি শেষপর্যন্ত আমাকে হাসিয়ে হাসিয়ে সাবাড় করবো।” মধ্যে থেকে বলে ফেললাম, “যাকগে, আসল ব্যাপারটা এবার বলুন তো দেখি।”

“শোনো বলি। তবো” বেশ জুং করে বসলেন তিনি পাইপে কয়েকটা সুখটান মেরে।

তারপর শুরু করলেন, “খুব সংক্ষেপে বলছি, তবে গোড়াতে বলে রাখা ভালো, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। প্রকাশ হলে আমার চাকরির একেবারে দফা-রফা।”

বলুলম, “আচ্ছা, বলুন নিশ্চিন্তে।”

দুপৌ ফোঁড়ন কাটল, “অথবা, না বললেও চলবে।”

“ইয়ার্কি রাখো, মন দিয়ে শোনো দিকিন। ওপরতলার বিশেষ এক অভিজাত লোক আমাকে জানিয়েছে তাদের রাজপ্রসাদ থেকে অমূল্য একটা দলিল চুরি গেছে। আসলে দলিলটা যে চুরি করেছে তাকে সবাই চেনে। কারণ দলিলটা হারাবার সময় লোকে তাকে দেখেছে। আর সেটা এখনো তার কাছেই আছে।”

“বেশ, কিন্তু এখনো যে তার কাছে আছে সেটা জানা গেল কেমন করে? দুপৌর প্রশ্ন।

জি উত্তর দিলেন, “দলিলটার বিষয়বস্তু থেকেই একটু বোঝা যায়। চোরের হাত থেকে অন্য কারুর কাছে সেটা গেলে এমন কিছু অবিশ্যি ঘটত, যা এখন

পর্যন্ত ঘটেনি।”

ব্যাপারটাকে আরো একটু বিস্তারিত করতে বললাম। জি বেশ ঝানু কুটনীতিবিদের মতো মাথা দুলিয়ে বললেন, “এটুকু বলতে আপত্তি নেই যে, এই কাগজটার যে মালিক সে বিশেষ কয়েকটা ক্ষেত্রে অসীম শক্তিশালীও বটে।”

“কিছুই বোঝা গেল না।” দুপোঁ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

“হ্যাঁ, বুঝবে কী আর, মগজে কিছু আছে! মনে করো এই দলিলের ব্যাপারটা কোনো অজানা একজন লোকের কাছে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে একজন মানী লোকের মান ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। এজন্যে দলিল-চোর লোকটা মানী লোকটাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে।”

তাকে বাধা দিয়ে বললাম, “চোরের এই যে মালিককে হাতের মুঠোয় রাখবার ক্ষমতা এটা তো তার এটুকু জানার মধ্যে দিয়েই জন্মেছে যে, মালিক তাকে চেনে। কিন্তু এই যে চেনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া, এটা তো যে কোনো চোরের পক্ষেই দুঃসাহসের ব্যাপার একটা।”

মঁসিয়ে জি বললেন, “তাহলে ব্যাপারটা এবার আরো খোলাসা করা যাক। চোর হচ্ছে মন্ত্রী ডি— | সম্ভব—অসম্ভব কোনো কাজ নেই। যা এই লোকটা না করতে পারে, বা করতে এতটুকু ভয় পায়। চুরিটা যেভাবে সে করেছে, তাতেও যে অসম্ভব দুঃসাহস আর বুদ্ধির দরকার তাতে সন্দেহ নেই। দলিলটা আর কিছুই নয়, একটা গোপনীয় চিঠি, রাজপ্রাসাদেরই এক বিশিষ্ট মহিলাকে লেখা। প্রাসাদে নিজের ঘরে ওই বিশিষ্ট মহিলাটি যখন চিঠিটি পান তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। চিঠি পড়ছিলেন তিনি একেলা। ঘরে ঢুকল তৃতীয় লোকটি। এই লোকটির কাছ থেকে এই চিঠিটাকে গোপন করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মহিলা তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলেন চিঠিটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিতে, কিন্তু না পেরে অগত্য ওটাকে প্রকাশ্যে টেবিলের উপর ফেলে রাখলেন। চিঠির যা কিছু বিষয়বস্তু সেটাকে উপুড় করে রেখেছিলেন তিনি। উপরে ছিল ঠিকানা। কাজেই আগন্তকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি তাঁর পক্ষে। এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন ডি— | চিঠিটা তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়ল। তিনি ঠিকানায় লেখা হস্তাক্ষর তখুনি চিনতে পারলেন। মহিলার ঘাবড়ে যাওয়া ভাব তাঁর নজর এড়াল না। চতুর ডি-এর কাছে মহিলাটির গোপন রহস্য ধরা পড়তে বাকি রইল না। তিনি অভ্যেসমতো দ্রুতগতিতে কয়েকটা কাজের ব্যাপার সেরে নিলেন। তারপর অনেকটা ওই চিঠির মতো একটা কাগজ পকেট থেকে বার করে খানিকক্ষণ পড়বার ভান করলেন। একটু পরে সেটা টেবিলের চিঠির উপর অন্যমনস্কভাবে রাখলেন। মিনিট পনেরো ধরে আরো কয়েকটা কাজের কথা বলে শেষকালে বিদায় নেবার সময়ে তাড়াহড়োর ভাব দেখিয়ে নিজের কাগজটা না নিয়ে চিঠিটাই টেবিল থেকে তুলে নিলেন। মহিলাটি সবই দেখলেন। কিন্তু পাশেই তৃতীয় লোকটি বসে থাকায় একটা আপত্তি পর্যন্ত করতে পারলেন না। চিঠিটা পকেটে ফেলে মন্ত্রীমশাই বেরিয়ে গেলেন।”

“খাসা চোর তো।” আমার দিকে তাকিয়ে দুপোঁ। আবারো বলল, “তুমি যেমনটি চাইছিলে ঠিক তেমনটিই ঘটেছে। দেখো, এখানে চোর পরিষ্কার জানল যে, সে যার জিনিস চুরি করেছে সে তাকে চিনেছে। সত্যি, মালিকের ওপর চোর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।”

“ঠিক তাই। পুলিশের কর্তা বললেন আবার, “মন্ত্রী ডি এই যে ক্ষমতা লাভ করেছে, নানাভাবে সে এর সুযোগও নিচ্ছে ক-মাস থেকে। মহিলাটি বুঝতে পারছেন চিঠিটা উদ্ধার না হলে চলবে না। কিন্তু চোরকে জানা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে সেটা উদ্ধার করতে পারছেন না। তাই লোক জানাজানি না করে যাতে বুদ্ধি করে চিঠিটা উদ্ধার করা যায় সেইজন্য়েই তিনি আমার ওপরে এটার উদ্ধারের ভার দিয়েছেন।”

তামাকের ধোঁয়ার জালের মধ্যে থেকে দুপোঁ গভীর গলায় বলল, “তিনি যে এর চেয়ে উপযুক্ত লোক পেতেন না তাতে আমি নিঃসন্দেহ।”

জি এবার গর্বে ফেঁপে উঠলেন। বুক টান করে বললেন, “ঠাট্টা করছ, তাই না? কিন্তু তুমি বললেও যা, না বললেও তাই। সবাই জানে একজন সত্যিকার বিচক্ষণ লোকের ওপরেই কাজটার ভার পড়েছে।”

বললাম, আপনার কথা ঠিক ধরে নিলে এটুকু পরিষ্কার যে, চিঠিটা এখনো চোরের হাতেই রয়েছে। যতক্ষণ না ওটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অটুট থাকছে চোরের অসীম ক্ষমতা অর্থাৎ মহিলাটিকে হাতের মুঠোয় রাখবার ক্ষমতা। আসল উদ্দেশ্যে চিঠিটার প্রয়োগ হলেই লোকটির ক্ষমতাও শেষ হবে।”

মসিয়ে জি আমার কথার সমর্থন করলেন, তারপর বলতে লাগলেন, “আপনার এই কথার মূল বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই আমিও কাজ শুরু করেছি। আমার প্রথম কাজ হল মন্ত্রীর হোটেলটায় বেশ খুঁটিয়ে একটা খানাতল্লাশ করা। কিন্তু এতে বাঁধা আছে। এ কাজ মন্ত্রী বাহাদুরকে জানিয়ে করা চলবে না। আগেভাগে আমাদের কাজের খবর পেলে ফলটা খুব খারাপ করে তুলবে মন্ত্রীপ্রবর। এ বিষয়ে আমাদেরকে আগে থাকতে সাবধানও করে দেয়া হয়েছে।”

“তা হোক। এ ধরনের গোপন খানাতল্লাশিতে আপনারা— প্যারির পুলিশেরা তো একেবারে পোক্ত। আপনাদের কাছে। এ তো নাসিয়ার মতোই তুচ্ছ।”

“খাঁটি একটা কথার মতো কথা বলেছ হে। আমি এ ব্যাপারে একটুও ঘাবড়াবার পত্র নই। এদিক থেকে আবার মন্ত্রীর চলাফেরা জীবনযাত্রার গতিবিধিও আমার কাজের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধের হয়েছে। সারারাতই প্রায় তিনি বাড়িতেই থাকেন না। আর হোটেলের চাকরবাকরের সংখ্যাও খুব কম। সাধারণত মন্ত্রীর শোবার ঘর থেকে বেশ দুরেই চাকরবাকররা থাকে বা রাতে ঘুমোয়। এই অবস্থায় দু-এক পাইট গিলিয়ে ওগুলোকে বেহুঁশ করা বিন্দুমাত্র শক্ত নয়। তোমরা জানো বোধহয়, আমার কাছে এমন চাবি আছে যা দিয়ে প্যারির যে কোনো বাক্স বা তালা খুলতে পারি। আর পেরেওছি। এই তিন মাসে এমন একটা রাতও যায়নি

যে-রাতে আমি মন্ত্রীটির বাড়ি খানাতল্লাশ করিনি। প্রায় সবসময়েই নিজের হাতেই আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছি। তোমরা স্বীকার করবে, এ লাইনে আমার একটা সুখ্যাতি আছে, আর তার ওপর আবার মোটা পুরস্কার। কাজ আমাকে শেষ করতেই হবে। এবং তাই সেটা চালিয়েও যাচ্ছিলাম। খানাতল্লাশিও চলছিল। কিন্তু বোঝা গেল চোর। আমার চেয়েও চালাক। বাড়ির মধ্যে এমন কোনো ঘরে এমন কোনো গোপন কোণ-রোঁজ দেখতে বাদ দিইনি যেখানে নাকি কাগজটা লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।”

বললাম, ‘চিঠিটা যখন চোরের কাছেই আছে তখন কি ধরা যায় না যে, সেটা সে নিজের বাড়িতে না রেখে অন্য কারুর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে পারে।’

এবার দুপৌঁ বলল, “না, এটা সম্ভব নয়। রাজসভার পরিবেশ যেরকম প্যাঁচালো হয়ে উঠেছে। ইদানীং আর মন্ত্রী ডি যেসব নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে রটেছে; তাতে করে মনে হয়, সে এই চিঠির মালিক হওয়াটাকে যেমন গুরুত্ব দেবে, ঠিক তেমনি প্রয়োজনবোধে খুব সহজেই ওটাকে সরিয়ে ফেলে দেবারও সুযোগ রাখবে।”

“সরিয়ে ফেলার মানেটা কী বুঝলাম না!” আমার প্রশ্ন।

দুপৌঁ বলল, “অর্থাৎ, দরকার পড়লে ওটাকে নষ্ট করে ফেলার সহজতম একটা উপায় বা পদ্ধতি।”

“তা হলে বোঝা যাচ্ছে ওটা নিশ্চয়ই মন্ত্রীর ঘরেই আছে।”

জি সায় দিলেন। আমার কথায়। তারপর বললেন, “আরো ব্যাপার শোনো, আমার লোকেরা কয়েকবার তার সঙ্গে ধাক্কা লাগার ভান করে তার জামাকাপড় পর্যন্ত চট করে তল্লাশ করে নিয়েছে। হ্যাঁ আমার সামনেই এবং নিখুঁতভাবেই। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।”

দুপৌঁ হেসে বলল, “দেখুন, আপনারা এতটা তকলিফ না করলেও পারতেন। ডি তো আর কচি খোকা নয় যে, এমনভাবে পুলিশের জন্যে চিঠিটা পকেটে ওঁজে ঘুরে বেড়াবে।”

মঁসিয়ে জি হেসে বললেন, “কথাটা ঠিক, বোকা একেবারে নয়, তবে কিনা লোকটা আবার কবি। আমার মনে হয়, কবিতা আর বোকাতে বিশেষ তফাত নেই। এই কবির পরেই স্থান দেয়া যেতে পারে মুখকে।” দুপৌঁ তার পাইপে সুখটান দিল বেশ কয়েকটা। তারপর বলল, “বলেছ বেশ, আমারও দু-একটা ছত্র লেখার বদ অভ্যাস আছে।”

মঁসিয়ে জি-কে তাঁদের খানাতল্লাশির পূর্ণ ও বিস্তারিত একটি বিবরণ দিতে বললাম। তিনি আপত্তি না করেই শুরু করলেন:

“আমাদের হাতে সময়ের অভাব ছিল না। তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে সব খুঁজে দেখায় কোনোরকম বাধাই ছিল না। এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাও খুব বেশি। গোটা বাড়িটা খুঁজে দেখার জন্যে আমরা মোট সাত রাত সময় নিলাম। প্রথমে আমরা প্রত্যেকটি ঘরের আসবাব নিয়ে কাজ শুরু করলাম। প্রত্যেকটি

আসবাব বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল। ড্রয়ার, তাক কিছুই বাদ গেল না আমার লোকদের। গোপন ড্রয়ার জাতীয় কিছু লুকোনো কোণ-ঘোজি আসবাবপত্রগুলোর মধ্যে পাওয়া গেল না। আর এগুলো থাকলে আমাদের মতো শিক্ষিত পুলিশ কর্মচারীর বাজের মতো তীক্ষ্ণ চোখ থেকে তা এড়িয়ে যেতে পারত না। তার কারণ এসব পরীক্ষার ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু হিসাব আছে। সেগুলো আমাদের একেবারে কণ্ঠস্থ। যে কোনো আসবাবপত্র তা যেভাবেই তৈরি হোক না কেন তার একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব আর নির্দিষ্ট আয়তন আছে। এই বাইরের আয়তন ও ভেতরের আয়তন হিসাবে মিলতে বাধ্য। আমাদের ব্যবহার্য রুলকাঠি এবং এইজাতীয় সরঞ্জামগুলো একেবারে নির্দিষ্ট মাপের। কোনো একটা রেখার পঞ্চাশ ভগ্নাংশের এক অংশও আমাদের হিসাবকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। দেরাজ আর আসবাবগুলো পরীক্ষা করার পর আমরা চেয়ারগুলো ধরে কাজ শুরু করলাম। প্রত্যেকটি চেয়ার আর সোফার কুশনের মধ্যে লম্বা সব উঁচ ঢুকিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করা হল। তারপর টেবিলগুলোর মাথার তক্তা খুলে ফেলে পরীক্ষা করা হল।”

“এটা কেন করলেন?”

“অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখতে হলে টেবিল বা এই ধরনের আসবাবের ঠিক মাথার ওপরকার তক্তা খুলে ফেলা হয়। তারপর সেখান থেকে একটা পায়ার মাথার দিকে মাঝখান বরাবর খুঁড়ে গর্ত করা হয়। খাটে মশারি খাটাবার ডাঙা। আর পায়াতেও এই ধরনের গোপন খোপার কাটা যেতে পারে।”

“কিন্তু এ ধরনের কাজের ঝুঁকিও তো কম নয়। বাইরে থেকে ঘা মেরে ভেতরের ফাঁপা অংশ ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা কি নেই বলতে চান?”

“না, সেটা সম্ভব না-ও হতে পারে। লুকোনো জিনিসটার চারধারে তুলো বা ন্যাকড়া গুঁজে ফাঁকটা ভরাট করে দিলে। ওভাবে টোকা মেরে বাইরে থেকে টের পাওয়া শক্ত। আর আরো শক্ত হল এই যে, আমাদের তো কাজ করতে হয়েছে রীতিমতো সংগোপনে।”

“আপনি তো এভাবে সব আসবাব একটা একটা করে খুলে দেখবার সময় পাননি। তাই না? ধরুন চিঠিটাকে পাকিয়ে সরু করে একটা আসবাবের মধ্যে এই ধরনের একটা ফুটো করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। কোথায় বা কোন কাঠের ফাঁকে এই ধরনের কাজ করে রাখা হয়েছে তা তো আপনি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেননি। তাহলে?”

“হ্যাঁ, তা করিনি বটে, তবে আমাদের পরীক্ষা তার চেয়েও যে নিখুঁত হয়েছে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। শুধু চেয়ার নয়, প্রত্যেকটি আসবাবের ফাটল, জোড় সব আমরা পরীক্ষা করে তবে ছেড়েছি। এটা কী করে করেছি শুনলে অবাক হবে। এটা করেছি খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। কোনো কাঠের জোড় যদি

সুস্ক্রতম ঘা-ও খেয়ে থাকে তাহলে সেই চুলের মতো চিড় খাওয়া অসমান জায়গাটুকু আমাদের এ যন্ত্রের চোখে ধরা পড়তে বাধ্য।’

“মুখ দেখা আয়নার ভেতর দিকটা, কাঠের মাঝখানটা, বালিশ, বিছানার চাদর, বা দেয়ালের, জানলার পরদা বা মেঝের কাপেট এসবও পরীক্ষা করেছেন নিশ্চয়ই?”

“নাও, শোনো কথা। এসব বাদ দেয়া যায়? যখন বাড়ির আসবাবপত্র দেখা শেষ হল তখন আমরা গোটা বাড়িটাকে নিয়ে পড়লাম। গোটা বাড়ির এলাকাটাকে আমরা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিলাম, তারপর সেইসব অংশে নম্বর দিলাম। উদ্দেশ্য, যাতে কোনো অংশ বাদ না পড়ে। শুধু মন্ত্রীর বাড়ি নয়, তার দুপাশের দুটো বাড়িও একইভাবে খুঁটিয়ে আমরা পরীক্ষা করে তবে না ছেড়েছি!”

অবাক লাগল। বললাম, ‘একটা নয়, তিন-তিনটে বাড়ি এইরকম করে আপনারা পরীক্ষা করছেন, আশ্চর্য তো!’

মঁসিয়ে জি বললেন, “উপায় তো নেই, পুরস্কারের বহরটা তো জানো?”

“বাড়ির সামনে পেছনে, খালি জায়গাগুলো পরীক্ষা করেছেন তো?”

“হাসালে ভায়া। এসব কি আমার মতো পাকা ও ঝানু একজন পুলিশ অফিসারকে আবার বলে দিতে হবে? খোলা জমিগুলো ইট দিয়ে বাঁধানো। তাতে করে আমাদের কাজের বেশ সুবিধেই হয়েছিল বলতে হবে। ইটের ফাঁকে ফাঁকে জমে-থাকা শ্যাওলাগুলো আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। কোনো ইট তুললে, ওই শ্যাওলাতেই তা ধরা পড়তে বাধ্য।”

“আচ্ছা। ধরুন, মন্ত্রীর ব্যক্তিগত পাঠাগার, তার বই, কাগজপত্র এসব?”

“হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বই আমরা পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটি পাতা উল্টে দেখা হয়েছে। মলাটের ঘনত্ব মেপে দেখা হয়েছে যন্ত্রের সাহায্যে। নতুন বাঁধাই করা বইগুলো আবার বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। লম্ববা ছুঁচ মলাটের এপার-ওপার ফুড়ে দেখা হয়েছে।”

“কার্পেটের তলার মেঝে, দেয়ালের আচ্ছাদন, কাগজ, বাড়ির কোণ—ঘোজগুলোও দেখেছেন তো?”

“আরে দাদা, সবই দেখা হয়েছে, সবই দেখা হয়েছে, শুধু যা দেখার জন্যে এত কাণ্ড, সেই চিঠিটারই দেখা পাইনি।”

‘এতই যখন করলেন এবং তবুও পেলেন না, তখন মনে হয় বাড়িতে সে জিনিস নিশ্চয়ই নেই।’

“সত্যি কথা বলতে কী, এখন আমরা তাই মনে হচ্ছে কিছুটা।” মঁসিয়ে জি এবার দুপৌর দিকে ফিরে বললেন, “কিহে ভায়া, শুনে নিশ্চয়ই আক্কেল গুড়ুমা এবার কী করা যায়?”

দুপৌ বলল, “আমার যতদূর ধারণা, সারাবাড়িটা আবার খুঁজে দেখা দরকার।” জি হাসলেন মুচকে, বললেন, “না হে, তার আর দরকার হবে না। আমাদের এত নিখুঁত এবং চমৎকার অনুসন্ধানের পর এটুকু নিশ্চিত্তে বলা যেতে

পারে যে, আমি যেমন বেঁচে আছি, নিশ্বাস নিচ্ছি, এটা যেমন সত্য; ঠিক তেমনিধারাই আর একটি সত্য হল, চিঠিটা আর যেখানেই থাকুক, মন্ত্রী ডি-এর বাড়িতে কোথাও নেই।”

দুপৌঁ বললে, “তা হতে পারে, কিন্তু আমি তো আর কিছু সুপথ দেখছি। হ্যাঁ ভালো কথা। চিঠিটার চেহারার একটা বিস্তারিত বিবরণ নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে।”

“সে আর বলতো” বলেই জি তার পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে তা থেকে চিঠিটার বাহ্যিক আকৃতির একটা বিশদ বিবরণ পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ করেই তিনি অত্যন্ত বিষন্নভাবে বিদায় নিলেন। হতাশার এমন জীবন্ত প্রতীক আর দেখিনি।

মাসখানেক পরের কথা। জি আবার এলেন। সেদিনও আমরা দুজন চুপচাপ বসে আছি। একটা চেয়ারে বসে তামাক টানতে টানতে তিনি নানান কথা বলতে লাগলেন। তাকে সেই চিঠির কথাটা মনে করিয়ে দিলাম। জিগ্যেস করলাম তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল কি না। এ-ও জিগ্যেস করলাম যে, শেষপর্যন্ত তিনি নাজেহাল হয়ে চতুর মন্ত্রীর বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন কি না।

আমার কথায় জি একেবারে ক্ষোভে যেন ফেটে পড়লেন। ‘ব্যাটা উৎসর্গে যাক। দুপৌঁর উপদেশমতো আবার আমি সারাবাড়িটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি। জানতাম কিছুই হবে না। হলও তাই।’

দুপৌঁ হঠাৎ বলল, “পুরস্কারের অঙ্কটা কত ছিল যেন?”

জি এবার কেমন যেন আমতা আমতা করতে লাগলেন। “তা বেশ মোটা টাকাই। মানে ঠিক পরিমাণটা না বললেও ধরে নিতে পারো পুরস্কারটা বেশ মোটা রকমেরই। তবে হ্যাঁ, একটু জেনে রাখো, চিঠিটা যদি কেউ আমার হাতে এনে দিতে পারে তাহলে আমি তাকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিতে রাজি আছি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কী জানো? ব্যাপারটা দিনের পর দিন জটিল আকার ধারণ করছে, আর এদিকে পুরস্কারটাও ফুলেফেপে ডবল হয়েছে। কিন্তু তাতে আর লাভ কী! তিনগুণ হলেও, যা করেছি, তার বেশি আর কিছুই করবার নেই।”

পাইপটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে দুপৌঁ বলল, “কথাটা ঠিক। তবু বলব, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে ঠিক যতটুকু করা উচিত ছিল, তা তুমি করেনি। এর জন্যে আরো একটু পরিশ্রম করতে পারতে না কি?”

“কীরকম?”

‘ধরো’ তামাকের ধোঁয়ার আড়াল থেকে দুপৌঁ বলতে লাগল, বিচক্ষণ লোকের কাছ থেকে এ বিষয়ে সংপরামর্শ নেয়া কি উচিত ছিল না তোমার? অ্যাবারথোনির সেই গল্পটা জানো তো?”

“জানি না, চুলোয় যাক তোমার ওই অ্যাবারথোনি।”

“হ্যাঁ, চুলোয় যাক বা ফাঁসিতে ঝুলুক, গল্পটা কিন্তু জানা দরকার। অ্যাবারথোনি ডাক্তার ছিলেন একজন। এক কিপটে লোক একবার মতলব করল

তাঁর কাছ থেকে নিজের দেহটা পরীক্ষা করিয়ে নেবে নি—খরচায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে একদিন গল্প করতে করতে একটা কাল্পনিক রোগীর নাম উল্লেখ করলে। সে এইভাবে বললে ব্যাপারটা: ধরুন, লোকটার নাম এই, তার রোগের এই উপসর্গ। অথচ সে নিজের উপসর্গগুলোই হুবহু বলে গেল। তারপর বলল, ‘এবার একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি তার রোগের জন্যে কী ব্যবস্থা দেবেন? অ্যাবারথেনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, “ব্যবস্থা আমি আর কী দেব। সে নিজেই তার ব্যবস্থা ঠিক করে নেবে। ভালো একটা ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেই করবো।”

মঁসিয়ে জি একটু কঁচুমাচু হয়ে গেলেন। পরে সামলে নিয়ে বললেন, “শোনো কথা। আমি কি ফোকটে উপদেশ চাইছি তোমার কাছে। উপদেশের উপযুক্ত দামও দিতে আমি পিছপা নই।”

“তাই নাকি? বটে বটে।”

“আলবৎ, দেবই তো। এ ব্যাপারে কাজের মতো কাজ করে যে আমাকে সাহায্য করবে: তাকে আমি নিজেই পঞ্চাশ হাজার ফ্রা দিতে রাজি আছি।”

দুপৌঁ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। একটা দেরাজ খুলে একখানা চেকবই বার করে জি-এর সামনে সেটা ধরে বলল, “তাহলে তোমার কথামতো টাকার অঙ্কটা লিখে চেকে যথারীতি সই করে দাও দিকিনা। চেকটা সই করে আমাকে দেয়া মাত্রই, তোমার ঙ্গলিত চিঠিটাও তুমি পেয়ে যাবে।”

দুপৌঁর কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মঁসিয়ে জি-এর অবস্থা আরো খারাপ। তিনি বেকুবের মতো বসে রইলেন। চোখ ছানাবড়া। মুখের হাঁ। আর বোজে না এমনি নিস্পন্দ, নির্বাক অবস্থা তাঁর। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি আস্তে আস্তে একটা কলম তুলে নিলেন। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকাবার পর চেকবইয়ের একটা খালি পাতায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর অঙ্ক বসলেন, তারপর দুপৌঁর দিকে শেষবারের মতো আর—একবার অবাক হয়ে তাকিয়ে চেকে নাম সই করে দিলেন। চেকটা দুপৌঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমার তেমনি বসে রইলেন। দুপৌঁ চেকটা ভালো করে পরীক্ষা করে সেটাকে পকেটখাতার মধ্যে সযত্নে রেখে খাতাটা পকেটে রাখল। তারপর চাবি দিয়ে আর একটা দেরাজ খুলে তা থেকে একটা চিঠি বার করে জি-এর হাতে তুলে দিল। জি তো একেবারে উত্তেজনায় কাঁপছেন। তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিটার ভাঁজ খুলে ফেললেন। ওটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই তিনি তাড়ক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কোনোরকম কথা বা বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই একলাফে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জি চলে যাওয়ার পর দুপৌঁ তার বক্তব্য শুরু করল:

“প্যারিস পুলিশ সত্যি কাজের উপযুক্ত। অধ্যবসায় প্রতিভা আর চতুরতা যেটাই ধরো না কেন, কোনোদিক থেকেই এদের কোনো খুঁত পাবে না। কর্তব্য পালনের যে জ্ঞান তা-ও এদের আছে। ফলে মন্ত্রী ডি-এর বাড়িতে খানাতল্লাশির

যে বিস্তারিত বিবরণ জি আমাদের শুনিয়েছিল, তাতে আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। বুঝেছিলাম তাদের পক্ষে যা করা দরকার তাতে তারা গাফিলতি করেনি। যতটুকু তাদের পক্ষে করা সম্ভব সবই তারা করেছিল।”

প্রশ্ন করলাম, যতটুকু করা দরকার বলতে কী বোঝাতে চাও?”

দুপৌঁ বলল, “কথাটা ঠিকই। অর্থাৎ পুলিশ আসল চিঠিটা খুঁজে বার করতে যেসব পথ বা উপায় বেছে নিয়েছিল, তাদের এই ধরনের কাজের পদ্ধতি মতে সেগুলো নিঃসন্দেহে নিখুঁত। তাদের এই খুঁজবার যে এলাকা, তার মধ্যে জিনিসটি থাকলে তারা ঠিক ওটাকে বার করে নিতে পারত।”

কথা শুনে হাসি পেলেও দুপৌঁর মন্তব্যকে স্বেচ্ছা রসিকতা বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। দুপৌঁ বলে যেতে লাগল, “যেসব পদ্ধতি তারা নিয়েছিল, তাদের কাজের নিয়ম অনুযায়ী তাতে কোনো দোষ পাওয়া যাবে না। হয়তো বলবে তাহলে গলদটা কোথায় ছিল? গলদটা ছিল এই যে, ওই পদ্ধতি ঠিক এমনি ধরনের একটি ব্যাপারে প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল না। বাঁধা-ধরা পদ্ধতিতে তাদের পক্ষে বাঁধা-ধরা ঘটনার ওপরেই বেশি করে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এ ঘটনাটা বাঁধা-ধরা মামুলি একটা ব্যাপার নয়। এর মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে যেমন, ঠিক তেমনি এ সমস্যার সমাধানেও কিছু পার্থক্য রাখার দরকার ছিল। মঁসিয়ে জি-এর এসব ব্যাপারে একটা ছকে কাটা নিয়ম বা কার্যপদ্ধতি আছে। সব ব্যাপারেই সে সেই নিয়ম প্রয়োগ করে থাকে। ফলে অনেক ব্যাপারে, যেটা নাকি শক্ত তাতে সে সরল হয়ে পড়ে; আবার যেটা নাকি সরল তাতে অনেক সময়ে শক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তার ভুল হয়ে যায়, গুলিয়ে যায় আগাগোড়া ব্যাপারটা। মনে হয় এ ব্যাপারে তার বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। এইভাবেই অনেক সময়ে একজন সাধারণ স্কুলের ছাত্রের চেয়েও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। খুব কম বয়সী, বোধহয় আট বছর বয়সের একটা স্কুলের ছাত্রকে জানি আমি। জোড়-বিজোড় খেলবার ব্যাপারে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারপদ্ধতি অনেক বড়মানুষকেও অবাক করে দিত। খেলাটা খুবই সোজা। একজন খেলোয়াড় কয়েকটা কাচের গুলি হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আর একজনকে জিগ্যেস করে জোড় না বিজোড়। যদি উত্তরদাতার আনন্দাজটা ঠিক হয় তাহলে সে একটা গুলি জেতে। এইভাবে খেলা চলে। যে ছেলেটার কথা বলছি সে গোটা স্কুলের সবারই গুলি জিতে নিত। কিন্তু কী পদ্ধতিতে জিতত সেটাই আমার বক্তব্য। তার এই জোড় বা বিজোড় বলার মধ্যে, এই আনন্দাজ করার মধ্যে সে সবসময়েই একটা মূলনীতি মেনে চলত। সেটা হল প্রথমে তার প্রতিপক্ষের বুদ্ধির একটা মোটামুটি বিচার সে করে নিত। হয়তো প্রথমেই সে বুঝে নিল যে, নিতান্ত একটা মোটামুটির ছেলের সঙ্গে সে খেলছে। এমনি অবস্থায় সেই ছেলেটি হাতের মুঠোর মধ্যে গুলি রেখে যখন জিগ্যেস করত, জোড় না বিজোড়, তখন ছেলেটি বলত বিজোড়। হয়তো প্রথমটা ঠিক হল না। ব্যস এর পরের বারেই সে বলে বাসল, বিজোড়। এই বলার কারণ এই যে, প্রথমটার নিশ্চয়ই উল্টোটা, অর্থাৎ বিজোড়ই এবার সে নেবে।

অনুমান ঠিকই হত। কিন্তু আর একটু প্রখর বুদ্ধির প্রতিপক্ষের কাছে সে আবার পদ্ধতি বদলে নিত। সেখানে সে এই মূলনীতি অবলম্বন করত: প্রথমটা, ধরা গেল, বিজোড় বলে হার হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ জোড় নিয়েছে। এবার হয়তো প্রথমবারে সেই বোকাটার মতো জোড় থেকে বিজোড়ে বদল করবে না। অর্থাৎ এবারও সে জোড়ই নেবে। এই পদ্ধতিতে ছেলেটাও জোড় বলল, আর জিতেও গেল। এখন বুঝছ, এটা বরাত নয়। স্কুলের ছেলেটার একটা মূলনীতিই তার এই ধরনের ঠিক ঠিক ঘোষণার পেছনে সবসময়েই কাজ করেছে। তাহলে এখন বল আমার কী করণীয় ছিল?”

“এমন কিছুই নয়। তোমার যা করার ছিল তা হল প্রতিপক্ষের বুদ্ধির একটা শেষ সীমানা আগে থাকতে নির্ধারণ করে নেয়া।”

“ঠিক তাই। প্রতিপক্ষের বুদ্ধির সাথে নিজের বুদ্ধির এমনি করে একটা তুলনামূলক শক্তিপরীক্ষা করে নিয়ে তারপর কাজে নামাই হল প্রধান কাজ। কিন্তু কী করে এমন আগে থাকতে একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব, সে কথা ছেলেটাকে জিগ্যেস করেছিলাম। সে বলেছিল, সে যখন প্রতিপক্ষের বুদ্ধির বা ভালোমন্দের ধারণা করবার চেষ্টা করত তখন তার মুখের ভাব লক্ষ করত, তারপর সেই ভাবটা নিখুঁতভাবে নিজের মুখে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। এই ভাব নিজের মুখে ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সে এ ভাবের প্রতিক্রিয়া কীভাবে তার নিজের মনে ছায়াপাত করে সেটা অনুভব করত। রাসফুকো লে বুগিভ, মেকিয়াভিলি বা কম্পানেল— এঁদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির তো প্রশংসার শেষ নেই, কিন্তু এখন বুঝতে পারবে এ সবই এই স্কুলের ছেলেটিরই অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতারই ছায়ামাত্র।”

‘এতে বোঝা যায়, প্রতিপক্ষের বুদ্ধির সাথে নিজের বুদ্ধির একটা অভিন্ন বা কমবেশি। যোগাযোগ নির্ধারণ করতে হলে প্রথমেই প্রতিপক্ষের বুদ্ধির শেষ সীমানা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হিসাব আগে থাকতেই ঠিক করে নিতে হবে। তাই না দুপোঁ?’

আমার কথায় দুপোঁ বলল, “সেটাই হল কাজের মধ্যে প্রধান। জি ও তার সহকারীরা যে প্রায়ই এত ভুল করে, তার কারণ তোমার ওই নিজের মনের সাথে প্রতিপক্ষের মনের যোগাযোগ বা অভিন্ন করাটুকু দূরে থাক, যাকে কেন্দ্র করে এই সমস্যা তার বুদ্ধির বা মনের কোনো তুচ্ছতম হৃদিসও এরা রাখে না। নিজের বুদ্ধি বা কৌশল সম্বন্ধে এরা সজাগ। অর্থাৎ কোনো লুকোনো জিনিস খুঁজতে হলে এরা প্রথমেই ভেবে বসে নিজেরা হলে এ সময়ে জিনিসটা তারা কীভাবে কোথায় লুকোত। সাধারণ লোকের বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার দরকার হলে তাদের এই সাধারণ বুদ্ধিসম্মত পদ্ধতিতে কাজ হবে সত্যি, কিন্তু যখন তাদের সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে প্রখর বা ধূর্ত কোনো অপরাধীর কাজ সম্বন্ধেও তারা সেই একই সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ করবে তখন আর সফল হতে পারবে না। এইভাবেই যখন খুব জটিল কোনো ঘটনায় পড়ে বা পুরস্কারের পরিমাণ বেশি হয় তখন এরা এদের এই সাধারণ বুদ্ধিসম্মত প্রক্রিয়াগুলোই খুব জোরেশোরে কাজে লাগায়। কিন্তু

প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে যাবার চেষ্টা করে না। মন্ত্রী ডি-এর বাড়ি তল্লাশির ব্যাপারটা লক্ষ করলে দেখবে সেই সাধারণ প্রক্রিয়াগুলো কেমনভাবে অব্যাহত রেখে খুব বিস্তারিতভাবে কাজ করা হয়েছে। এরা সবই করেছে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করেছে কিন্তু প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে যায়নি বলেই সফল হতে পারেনি। জি বহুকাল ধরে একই ধরাবাঁধা পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধির কতকগুলি ছাচে ঢালা রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র। ওর এই ধারণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ও কতকগুলো খানাতল্লাশির ধরাবাঁধা পদ্ধতিকে খাড়া করেছে। এখানে সেগুলোকেই একটু বিস্তারিতভাবে কাজে লাগিয়েছে। জি-এর ধারণাটুকু মনে করে দেখা। ওর ধারণা কোনো কাগজ লুকোতে হলে চেয়ারের পায়ার গর্ত বা লুকোনো কোনো কোণ-ঘোঁজই বেছে নেয়া হতে পারে। এই ধারণাটা অতি সাধারণ বুদ্ধির মানুষেরই। সোজা মানুষ কোনোকিছু লুকোলে সেটা গোপন কোনো জায়গাতেই রাখবে। আর যে খুঁজবে সে-ও সেটা বার করবে। সাধারণ বুদ্ধির জোরেই। দেখেছি ওদের হাতে যখনি এমনি কোনো শক্ত ব্যাপার এসেছে কিংবা যখন কোনো জটিল ঘটনার জন্যে পুরস্কারটা বড় রকমের হয়েছে তখনি সে ব্যাপারে খুব কমই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের যত্ন আছে, ধৈর্য, গৌ, যা কিছু দরকার সবই আছে। ঘটনা সাধারণ, তাদের পদ্ধতিও তার সাথে খাপ খেয়ে গেছে। তাই বলছিলাম তোমায়, জি-এর খোঁজার আওতার মধ্যে চিঠিটা থাকলে নিশ্চয়ই সে পেয়ে যেত। কিন্তু তা ছিল না। এখানেই তার প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা। তার এলাকাটা কতদূর হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে ওর ধারণা নেই বা ছিল না। আমার এ কথা বলার কারণ এই যে, এর দ্বারা আমি জি-কে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, পুলিশের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে চোরের কার্যপদ্ধতির মিল না-ও থাকতে পারে। আমার এ-কথায় জি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার পরাজয়ের কারণ মন্ত্রী ডি-কে সে আগে থাকতেই নির্বোধ ভেবে নিয়েছিল, কারণ সে কবি।” “সত্যিই কি সে কবি? এরা তো শুনি দু-ভাই। দুজনই উচ্চশিক্ষিত। আমি তো জানি মন্ত্রী কবি নয়, সে একজন অঙ্কবিদ।”

দুপোঁ বলল, “মন্ত্রী ডি— একাধারে গণিতজ্ঞ ও কবি। খুবই বুদ্ধিমান। শুধু অঙ্ক জানলে অতটা বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আশা করা যেত না। অবলীলাক্রমেই পুলিশের কাছে নতি স্বীকার করত।”

“সত্যি তোমার এ ধরনের ব্যাখ্যা শুনতে অবাক লাগে। সাধারণ পৃথিবীর যা মত, তোমার দেখি ঠিক তার উল্টো। যুগের পর যুগ ধরে গণিতকেই বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ, তার বিচারকেই শেষ বিচার বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।”

দুপোঁ বলল, “ওটা তর্কের কথা। তবে এটুকু নিশ্চিত জেনো যে, গণিত জানার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ডি যদি কবিও না হত তাহলে জি-এর এই চেক আমাকে দেয়ার কোনো কারণই ঘটত না। সে লোকটা একসঙ্গে এই দুরকম গুণের অধিকারী বলেই আমি তার মানসিক ক্ষমতার যথাযথ রূপটা ধরতে পারার সুযোগ পেয়েছিলাম। জানতাম রাজসভায় লোকটা মস্ত মামী একজন। আবার তার

কুটবুদ্ধি ও সাহস সম্বন্ধেও আমার ধারণা ছিল। গোড়াতেই আমার একটা ধারণা হল যে জি-এর কাজের প্রক্রিয়াগুলো কখনোই ডি-এর অজানা থাকবে না। এমনকি রাস্তায় যে তাকে খানাতল্লাশ করা হবে তা-ও সে জানত। তার বাড়িতে তার অগোচরে যে তল্লাশি চালানো হবে তা-ও সে ধরে রেখেছিল। সে প্রায় রাতেই বাড়ি থাকত না বলে জি অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। কিন্তু তার জানা উচিত ছিল যে, ডি নিজেই এরকম করেছিল; তার কারণ সে চেয়েছিল তার বাড়ি পুলিশটা ভালো করে পরীক্ষা করে নিক। আর পরীক্ষার পর শেষপর্যন্ত একটা কোনো সিদ্ধান্তে আসুক। বাস্তবেও ঠিক তাই হয়েছিল। ফলে জি-এর বদ্ধমূল ধারণা হল যে, চিঠিটা আর যেখানেই থাকুক ডি-এর বাড়িতে নেই কখনোই। পুলিশের কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তোমাকে শুনিয়েছি, ঠিক সেটাই ডি-এর মাথাতেও এসেছিল। ফলে একটা জিনিস সাধারণ কোনো লোক সাধারণভাবে যেসব জায়গায় লুকোবার চেষ্টা করবে, সে সেসব জায়গা বেছে নেয়নি। আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, লোকটা চতুর, সুতরাং হোটেলের গোপনতম জায়গাতেও সে সন্তুষ্ট হবে না। কারণ সে জানত যত গোপনতমই হোক না। কেন, পুলিশ সে জায়গায় হাত দেবেই। এই অবস্থায় তার মতো চতুর লোক ওটা লুকোবার এমন একটা জায়গা বেছে নেবে যে জায়গা আসলে খুব সরল সোজা ও প্রকাশ্য। তোমার মনে আছে বোধহয়, এইজন্যেই বলেছিলাম, রহস্যটা খুব সোজা বলেই বোধহয় খুব জটিল। আমার এ কথায় জি খুব জোরে হেসে উঠেছিল।”

আমার ভালো করেই মনে ছিল সে দৃশ্যের কথা। দুপোঁকে সমর্থন করলাম।

সে বলে চলল, “ম্যাপ নিয়ে একধরনের মজার খেলা আছে। দুজন খেলোয়াড়ের একজন তার প্রতিপক্ষকে ম্যাপ থেকে একটা জায়গার নাম খুঁজে বার করতে বলে। সে নামটা নদী, রাজ্য, শহর বা মহাদেশ যারই হোক না কেন। ম্যাপে তো আর নামের কমতি নেই। তাই প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্যে এই অগণিত নামের ভেতর থেকে সবচেয়ে ছোট লেখা একটা নাম সে বলে। কিন্তু এ খেলায় যে সত্যিই পাকা ওস্তাদ, সে ছোট্ট নাম না বলে এমন একটা নাম বলে যে নামটা ম্যাপের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত বড় বড় অক্ষরে লেখা। রাস্তার উপরে সাইনবোর্ডের বড় লেখা যেমন পথিকের চোখকে এড়িয়ে যায়। এ-ও ঠিক তেমনি একটা ব্যাপার। ম্যাপের ওই বড় লেখাকে এড়িয়ে যাওয়াটাও ঠিক এমনি একটা মনস্তাত্ত্বিক ডুল ছাড়া আর কিছুই নয়। মজা হল এই যে, এই তত্ত্বটা প্যারিস পুলিশের জানা ছিল না। তাদের একবারও মনে হয়নি যে, দুনিয়ার লোকের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে ওই চিঠিটা ডি সবার চোখের, মানে নাকের ডগাতেই ফেলে রাখতে পারে। ঠিক ম্যাপের বড় লেখার মতোই ব্যাপার।

ঠিক উল্টোটি ভেবেছিলাম আমি। মন্ত্রীমশাই যে অগাধ জলের মাছ, তার বুদ্ধি, চালাকি এসবের কথাই আমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছি। আমি ভেবেছি তার যা বুদ্ধি সেটা কাজে লাগাতে গেলে সে নিশ্চয় চিঠিটা হাতের কাছেই রাখবে।

এদিকে জি-এর কাছে খবর পেলাম সাধারণ অনুসন্ধানের এলাকার মধ্যে চিঠিটা নেই। এতে করেই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলাম যে, মন্ত্রীমশাই চিঠিটা লুকোতে গিয়ে একটা অতি সাধারণ পথ বেছে নিয়েছে, অর্থাৎ সে চিঠিটা আদৌ লুকোয়নি। যা ভাবা তাই করা। সুন্দর এক সকালে চোখে একটা মেঘলা-চশমা লাগিয়ে মন্ত্রীমশাই'র আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে বাড়িতেই ছিল। ঝিমুচ্ছে, গড়াচ্ছে, হাই তুলছে, সর্বাঙ্গে আলস্য আর ক্লান্তির ভার। বলে রাখা ভালো, ডি-এর মতো কর্মঠ আর চটপটে লোক খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু সে প্রকাশ্যে সেটা দেখায় না।

“চোখদুটো কষ্ট দিচ্ছে তাই কালো চশমা পরতে হয়েছে- এ-কথাটা আগে থাকতে জানিয়ে দিয়েই আলাপ আরম্ভ করলাম। তার সঙ্গে সামনাসামনি আলাপ করতে লাগলাম বটে। কিন্তু চোখ আমার বনবন করে ঘুরে ঘুরে চারপাশে কাগজপত্র, চিঠি আরো কত কী যে ছড়ানো রয়েছে, সেসব দেখতে লাগল। সে তা টের পেল না। কিন্তু এখানে কিছু পেলাম না। আমার চোখজোড়া ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে গিয়ে পড়ল রূপোলি আর সোনালি কাজ-করা একটা কার্ড রাখা কাগজের ছোট্ট একটা বাক্সের ওপর। চৌকো একটা খোপের মতো দেখতে বাক্সটা। বাতিদানের নিচে ছোট্ট একটা পেতলের কড়ার মধ্যে দিয়ে নীল ফিতোয় ওটা বুলিয়ে রাখা হয়েছে। খোপের মধ্যে এলোমেলো করে গাঁজা রয়েছে কয়েকটা নামের কার্ড আর একটা মাত্র চিঠি। চিঠিটা দেখতে নোংরা মতো, খামটা মোচড়ানো, মুচড়ে আবার যেন তুলে রেখে দেয়া হয়েছে। খমের উপর বিরাট একটা কালো ‘ডি’ অক্ষর, আর পাশে ছোট ছোট মেয়েলি হাতে ডি-এর পুরো ঠিকানা লেখা।

চিঠিটা আমার চোখে পড়তেই মন উল্লসিত হয়ে উঠল “পেয়েছি, পেয়েছি” বলে। শুনলে অবাক হবে চোরাই চিঠিটার যে বিবরণ জি আমাদের শুনিয়েছিল, এ চিঠিটার সঙ্গে তার কোনোই মিল ছিল না। এর উপর দেখা যাচ্ছে সিলমোহরে বড় কালো অক্ষরে ‘ডি’ লেখা। চোরাই চিঠিটায় ছোট্ট লাল অক্ষরে ‘এস’ লেখা ছিল, সিলমোহরের ছাপ থাকার কথা ছিল। আর তার ঠিকানায় বড় বড় পুরুষালি হাতে রাজপরিবারের কোনো এক বিশিষ্ট জনের নাম লেখা থাকার কথা। দুটো চিঠির মধ্যে একটিমাত্র মিল এই যে দুটোই আয়তনে সমান। দেখামাত্রই আমার মনে হল দুটা চিঠির এই পার্থক্য কেন? আর ডি-এর এরকম নোংরা। দোমড়ানো চিঠিই বা কেন এখানে রাখা হল? পরিস্কার যেন দেখা হচ্ছে যে, এই চিঠিটার কোনোই দাম নেই, গুরুত্ব নেই। তাছাড়া সেটা এমনভাবে প্রকাশ্যে বুলছে যে, যে কেউই ঘরে ঢুকুক না কেন, তার নজরে একবার তা পড়বেই। ভাবটি: আমি অতি দুচ্ছ তবু আমাকে দেখে রাখে। আর দেখে রাখো মানেই আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতুহল শেষ।

আমি তো সন্দেহ নিয়েই গিয়েছিলাম, তাই আমার সে সন্দেহ এখন আরো দৃঢ় হল। অনেকক্ষণ মন্ত্রীমশাইর বাড়িতে রইলাম। তার একটা প্রিয় বস্তুর ওপর তুমুল

তর্ক করলাম অনেকক্ষণ। কথা বলছি কিন্তু আমার প্রাণমন আর চোখ দিয়ে ওই চিঠিটার রঙ, আয়তন, ওটাকে ওঁজে রাখবার ভঙ্গি— এসবই দেখছি। হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ করলাম। দেখলাম চিঠিটার দোমড়ানো ভাব স্বাভাবিক হলে যে ধরনের হত, এ যেন তার চেয়ে একটু বেশি। এতে আমার সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাঁজের উল্টোদিক ভাঁজ করলে জোর করে চাপার জন্যে যেভাবে দাগ পড়ে, চিঠিটার ভাঁজের দাগও অনেকটা সেইরকম। পরিস্কার বোঝা গেল চিঠিটার আসল ভাঁজের উল্টোদিকে দোমড়ানো হয়েছে। তারপর নতুন সাদা পিঠে নতুন করে সিলমোহর করা হয়েছে। আমার বুঝতে দেরি হল না। যে, এটাই আমার স্প্লিত সেই চিঠিটা। আর কয়েকটা কথার পর মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময় ইচ্ছে করেই তার টেবিলে আমার সোনার নাসি-কৌটোটা ফেলে এলাম।

পরদিন সকালে নাসি-কৌটোটা নেবার জন্যে আবার গেলাম মন্ত্রীর বাড়ি। ঠিক আগের দিনের তর্কটা আবার জমে উঠল। তর্ক যখন জমে উঠেছে তখন ঠিক জানালার বাইরে হঠাৎ পিস্তল ছোড়ার একটা শব্দ হল। তারপরেই কয়েকটা আর্তনাদ। প্রচণ্ড কোলাহল বাইরে। মন্ত্রীমশাই এক লাফ দিয়ে জানালার ধারে গেল ব্যাপারটা কী দেখতে। জানালার পাল্লা খুলে বাইরে শরীরটা কুকিয়ে সে দেখতে লাগল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। খোপটা থেকে চট করে চিঠিটা বার করে নিয়ে তেমনি দেখতে আর একটা নকল চিঠি সেখানে ওঁজে দিলাম। ওটা খুব যত্ন করে আমি বাড়িতে বসে তৈরি করেছিলাম। ডি-এর সিলমোহর পর্যন্ত নকল করে ওতে ছাপও দিয়েছিলাম। একটা। রাস্তার ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। একটা পাগলা লোক বন্দুক নিয়ে পাগলামি শুরু করেছিল। মেয়ে আর শিশুদের দলের মধ্যে সে নাকি গুলি ছুড়েছে। বলাবাহুল্য খুব হৈ চৈ কাণ্ড। কিন্তু গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ—এটা পরে জানা গেছে। শুনলে খুশি হবে লোকটাকে আমিই ওই কাজে লাগিয়েছিলাম। চিঠিটা পকেটে পুরে আমিও ডি-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। লোকজন পাগল বা মাতাল ভেবে লোকটাকে ছেড়ে দিল।”

এই কাহিনীর বৈচিত্র্য আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বললাম, “ওই নকল চিঠিটা আবার রাখবার দরকার ছিল কী? প্রথমদিনেই ওটা পকেটে পুরে চলে এলেই তো পারতো।”

“হয়তো তোমার কথাই ঠিক। ওভাবে নিলেই হয়ে যেত হয়তো এবং তাতে আমার ক্ষতিও হয়তো হত না কিছুই। তবে কী জানো, ডি-লোকটা একেবারে দুর্ধর্ষ মরিয়া স্বভাবের। ওর শরীর আর মন দুই-ই সমান শক্তিশালী। বাড়িতে ওর চাকরবাকরের অভাব নেই। তোমার মত অনুযায়ী ধরে যদি চিঠিটা সোজাসুজি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতাম, তাতে ফল এই হত যে, আমাকে জীবন্ত আর বেরিয়ে আসতে হত না ওখান থেকে। প্যারির কোনো লোকই বাইরে আর আমার অস্তিত্ব পেত না। এছাড়া আমার একটা কুটনৈতিক চালও ছিল এর মধ্যে।”

“তই নাকি? কী সেটা শুনি।”

“গত আঠারো মাস ধরে মন্ত্রীমশাই এই চিঠির জোরেই রাজবাড়ির সেই বিশিষ্ট মহিলাটিকে মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেছিল। এখন সে সেই মহিলার খপ্পরের মধ্যে এসে গেল। কারণ সে তো এখনই চিঠিটার হাতছাড়া হওয়াটা টের পাচ্ছে না। এদিকে সেই পুরনো নিয়মমতো যতই ওই মহিলাটির ওপর কর্তৃত্ব করতে যাবে, ততই সে নিজেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। এবং এর ফলে শিগগিরই তার পতন আশা করতে পোর। তার এই পতন যতটা বেশি হবে তার চেয়ে বেশি। হবে লজ্জা আর গ্লানি। নামতে কষ্ট নেই, একথা যে বলে বলুক— আমি বিশ্বাস করি, উঠতে হলে যেমন কষ্টের দরকার ঠিক তেমনি নামবার সময়েও কষ্ট আছে। গানের ব্যাপারটাই ধরো না কেন। চড়াইতে সুর নিয়ে যেতে যেমন কষ্ট, তেমনি আবার খাদে নামাও খুব সহজ নয়। মন্ত্রী লোকটা যে খাদে পড়বে তাতে আমার দুঃখ নেই। তার মতো পাপিষ্ঠের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতিও নেই। পাপিষ্ঠ বললাম তার কারণ, ওর বুদ্ধি আছে কিন্তু বিবেক নেই। এতে করে লোকটার অনেক সদগুণ থাকা সত্ত্বেও তাকে নরপিশাচ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।”

একটু হেসে দুপোঁ বলে চলল, “ওই মহিলাটি ওর মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে যেদিন প্রথম ওর প্রতি ঘৃণা দেখাবে সেদিনই ও বাড়িতে ফিরে আমার রাখা নকল চিঠিটা খুলবে। আর তখন তার মনের অবস্থা কী হবে কল্পনা করো। তার মধ্যে যে কথা সে পড়বে তাতে তার মন কীভাবে ভেঙে পড়বে তা সে জানে না।”

“সে আর বলতে! একেবারে সাদা কাগজটা দেয়া কি ভালো হত? আর তা দেয়ারও জো ছিল না, কারণ এই ডি-ই একবার ভিয়েনাতে আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছিল। এবার তার কিছুটা প্রতিদান দেয়া গেল। সে সময়ে এ প্রতিদান তাকে দিইনি। শুধু মিষ্টি কথায় বলেছিলাম, তার ব্যবহারটা আমার মনে থাকবে। আমার সে আশ্বাসের সঙ্গে আজকের কাজের একটা সেতু তৈরি করে দেয়া দরকার ছিল। তাই কছত্র লিখে দিয়েছি। আমার হাতের লেখা সে চেনে। তাই নিজের হাতে লিখে দিয়েছি অনেকটা এই ধরনের কটা কথা: “বুনো ওল বাঘা তেঁতুল সংবাদ।”